সূচীপত্র

সম্পাদকের নিবেদন

সময় এমনই যে হাত পা গুটিয়ে শুধু চুপ করে ব'সে থাকার কথা ভাবা যায় না। 'প্রতিটি মানুষ চার টন ডিনামাইট বিস্ফোরকে ঠাসা এক একটি পিপের ওপর ব'সে আছে, যেগুলির পরিপূর্ণ বিস্ফোরণ কমপক্ষে বারো বার পৃথিবীর বুক থেকে প্রাণের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারে।' এমন যখন অবস্থা সে সময় তো নয়ই। তখন আন্তর্জাতিক, জাতিগত বা ব্যক্তিগত কর্তব্যের টানে সজাগ, উদ্যোগী ও আত্মনিয়োজিত হতেই হয়। শিল্পী সত্তা ও কর্মীসত্তার সামগ্রিক পরিচয় এভাবেই আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে যখন দেখি এ দু'য়ের সম্মিলনে একজন কবি বা শিল্পী শ্রমজীবীদের পাশাপাশি হেঁটে এসে সামিল হচ্ছেন সংগ্রামী ঐক্যে।

আমাদের বিশ্বাস শান্তি আন্দোলন মানে বাৎসরিক উৎসব মিছিল পদযাত্রা ইত্যাদি রিচুয়াল নয়। জীবন মরণের প্রশ্নে মানুষ অত নিপাট ধোপ দুরস্ত ভদ্র হ'তে পারে না। আদপে যুদ্ধ সম্পর্কে বিচলিত বোধ করলেও পার-মাণবিক ও নক্ষত্র যুদ্ধ কত ভয়াবহ হতে পারে, গোটা মানব প্রজাতি যে পৃথিবী থেকে চোখের নিমেষে মুছে যেতে পারে, সে বিষয়ে বুদ্ধির জগতে একটা ধারণা করতে পারলেও, আবেগের জগতে এটা কোনো অভিজ্ঞতা নয়। এটা যতটা না ইনটেলেকচুয়াল তার চেয়ে অনেক কম ইমোশনাল। তাই এখনো এই প্রশ্নে আমাদের সমগ্র মানব সত্তা, অস্তিত্বের সামগ্রিকতা যুক্ত নয়।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো এই সংকলন যত ভালো হওয়া উচিৎ ছিল, তত ভালো আমাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও করে উঠতে পারিনি। তার বড় কারণ আমাদের আর্থিক সংগতির অভাব ও কপি রাইটের বেড়াজাল।

গোটা সমাজ-শরীর পচে গলে খসে গেলেও আমরা বিশ্বাস করি, এ বিশ্বাস যদি পরীর রাজ্যে বিশ্বাসের মতো শিশুর সারল্য হয়ও, তবুও বিশ্বাস করি— কবিরাই বিশ্বের বিবেক। তাই কোনো কবিই আজ সুখী নয়, বিবেকের দংশনে নীল। আমরা তাঁদের উৎকণ্ঠা আর জীবন ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ধরে রাখতে পেরে কৃতার্থ।

কবিতা মৃত্যুর উপাসক নয়। তার কণ্ঠে জীবনের আদিমতম মন্ত্র। আমরা সাধ্যমত সেই মন্ত্রটি সঞ্চয়ন করে পাঠকের কাছে নিবেদন করলাম। এ শুধু কর্তব্য, এ শুধু বিবেকের তাগিদ নয়। মানবিক দায়িত্বও নয়। জীবনের পূজায় এই আমাদের সামান্য অর্ঘ্য।

অমিয় চক্রবর্তী

মার্কিনে দানব

১ বোমারুর আশ্বাস

এক হাতে ওর গাজর আছে, আরেক হাতে বোমা—
গাধার বাচ্চা চমকে বলে, ওমা।
(ধনপতির রক্ত দেখে ভয়ে ভয়ে হাসে)
(গণপতির চোখে চাবুক, চাতুরী আশ্বাসে)
(রণপতির বিশ্বনেশা ঘিরলো ভুবন ত্রাসে)
গাধার অতো বুদ্ধি তো নেই। কী হলো জানো, মা?
অতিবুদ্ধির ব্যাপার দেখে প্রায় হলো তার কোমা।
(জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে)
গরিব মানুষ, মাঠের মানুষ, বোঝো এই উপমা॥

২ নেগোসিয়েশন

নেগোসিয়েশন—
নিশ্চয় করবো আমি নেগোসিয়েশন
লাঠি মেরে করাবোই নেগোসিয়েশন।
নেগোসিয়েটর:
আমি প্রভু, তুই তুচ্ছ, নেগোসিয়েটর,
নেইই তুই, আমি শুধু নেগোসিয়েটর।

(উপসংহার)
বিনা শর্তে, শুধু শর্ত আমার আদেশ,
না শুনলে পোড়াবো তোর ঘর দোর দেশ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরমাণবিক

আকাশের নীল স্তব্ধতা ওরা ভাঙে
বোমারু বিমানে স্পর্ধিত হুঙ্কারে,
মাটির শ্যামল স্নেহ মুছে দেয় ওরা
জবীন দহন বিষে,
নারী ও শিশুর বোবা বিহ্বল
নিরুপায় যন্ত্রণা,
ওদের হত্যা মহোৎসবের উপাদেয় উপাচার।

মূঢ় পিশাচেরা জানে না
তাজা মানুষের রক্ত যে নয়
ডেরিক-এ শোষিত পাতাল-কাহিনী ক্লেদ
শুধু পাতকের দূষিত ছোঁয়াচ ছড়াবার!
সকল কালের সব মানুষের জন্যে
নিজেদের যারা বলি দিয়ে যায়
অকাতরে হাসিমুখে,
তাদের প্রতিটি রক্তবিন্দু পরমাণবিক তেজে
সংহত হয়ে মুহূর্ত গোনে
প্রলয় বিস্ফোরণের।

ডেরিক-বাহন দম্ভের শোনো
—গর্জন নয়, হতাশ নাভিশ্বাস।

অরুণ মিত্র

কসাকের ডাক : ১৯৪২

আজভের পিঠের উপরে
চাবুকের শিস শোনো।

দুই হাজার মাইল দূরে
ঝড় উঠে মিলিয়ে গেল সুমেরু-শিখরে,
মিলিয়ে গেল তুন্দ্রার তুষার-শিবিরে,
ভাল্‌দাই পাহাড়ে
রক্তের দাগ শুকিয়ে এল বুঝি।
সাঁজোয়া থাবা বাড়িয়ে সেই বুড়ো জানোয়ার
ছিঁড়তে চেয়েছে হৃৎপিণ্ড—
বিশ্বাসঘাতী বাঘনখ প্রতিহত—
মস্কো···মস্কো!

তারপর অগণিত প্রেতমূর্তি নামে
দক্ষিণে
কালো মাটি চিরে—
১৯১৭-র নভেম্বরের সকাল
বিদ্যুৎগতি অন্ধকারে
জারজের উত্তরাধিকারে আচ্ছন্ন আবার।
এবার কসাকের কড়া পাঞ্জায় চূড়ান্ত মীমাংসা।
মজ্জায় মজ্জায় এ কৃষাণকে চেনো :
ইউক্রাইনের গমের চারায় কুলাকের হাড়ের সার,
আর ধমনীতে ডনের স্রোত।
জনসাধারণ অসাধারণ।

কৃষ্ণসাগরের কাল ফণায় অপূর্ব আক্রোশ—
দুশমন!
আজভের মাথার উপরে ঝাপট,

ডনের রক্তস্রোতে ডাক :
সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও—
সাদা রুশিয়ার ভাই হো
বড় রুশিয়ার ভাই
সারা দুনিয়ার ভাই হো
এক সাথে দাঁড়াই
দুশমন রুশিয়ার
দুশমন দুনিয়ার
হাতিয়ার দাও ভাই হো
হাতিয়ার।

সমতলের শব্দ পাথরে পাথরে বাজে কঠিন।
উরালে কলকারখানায় ঘর্মস্নান,
দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর সাইবেরিয়া অশ্রান্ত,
পামীরে ককেশাসে কঠিন আওয়াজ—
সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও।

স্টেপ্‌-এর আদিগন্ত মায়া মরুবালুতে বিলীন।
সার্থবাহপথে কে যায়—কারা ?
উটের কঙ্কালের ছায়ায় অস্পষ্ট কবন্ধের পাল।

খিবা বোখারা সমরকন্দ থেকে লোহার গাড়িতে
আসে মানুষ কাতারে কাতার।
ডনের দুই তীরে অশ্বক্ষুর-স্ফুলিঙ্গ,
খোলা তরোয়ালে রক্তের তাল,
আর ডনের মোহানায় ডাক :
গোলামের দল ফাঁস জড়ায়
পূবে পশ্চিমে বিষ ছড়ায়
সাপের শ্বাস
প্রভু আমাদের চায় মরণ
অগ্রদূতের প্রাণহরণ

সর্বনাশ
ভাই হো

জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া
সোভিয়েট রুশিয়া
জান দিয়ে রাখব এ দুনিয়া
রাখবই
ভাই হো
তোমাদের দুনিয়াকে রাখব
রুখবই দুশমন রুখব
দোসরের মুখ চাই ভাই হো···
হাতিয়ার।

গোলাম কুদ্দুস
আয় তোরা আয়

রাস্তায় পাগলের প্রলাপ—
ব্রহ্মাণ্ড উড়িয়ে দেবে বোমা মেরে ?
আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তো আমারই,
মারি তো আমিই মারব।
ওদের মারার
একমাত্র অধিকার আমার।
মারব কি, মেরেছি !
ভেবেছিলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে ?
পালাই, পালাই, তোমাদের জব্দ করে পালাই।
আমার অনেক কাজ, পালাই,
রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা করে
এই বেলা বুঝিয়ে দিতে হবে বোকাদের।

চাঁদ উঠেছে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী।
ভেসে আসছে কত মুখ আমার মনে।
অল্পদিনের ব্যবধানে চলে গেল
কত বন্ধু, আত্মীয়, কমরেড।
ইচ্ছে করে যারা বেঁচে আছে এখনো
তাদের বুক দিয়ে আগলে রাখি।

রাক্ষসকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে তো পেরেছি আমরা
একটানা চল্লিশ বছর,
আমরা জেগে আছি, তাই ওরা ঘুমিয়ে আছে।
আমাদের ঘুম পাড়িয়ে ওদের জাগিয়ে তোলার
চেষ্টা চলছে অহরহ।

ফরিয়াদী হিরোসীমা নাগাসাকি।
একটানা চল্লিশ বছর জেগে আছে, আঙুল উঁচিয়ে
বিচার চাইছে! বিচার চাইছে জনপদ, গাছপালা
পশুপাখী, জলবায়ু, মৃত্তিকা,
ধ্বনিত হচ্ছে জীবনের ব্যক্ত-অব্যক্ত অভিযোগ।
নিঃসঙ্গ মহাকাশে প্রাণপূর্ণ পৃথিবীর
বাঁচার কী করুণ মিনতি—
নিভিয়ে দিয়োনা অনন্তের বুকে
জীবনের একমাত্র দীপশিখা!

বিবেক মায়ের মতো জেগে আছে জীবন শিয়রে,
উচ্চ থেকে উচ্চতর গম্ভীর নিনাদে
বলয়ের মতো ঘিরে ফেলছে বিশ্বকে—
আয় তোরা আয়, যার যা আছে
তাই নিয়ে আয়!
মহা-রাক্ষসের মরণ ঘুমের আয়োজনে আয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

স্তালিনগ্রাড

এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখে নি কখনো,
বসন্ত গলিতপত্র ;
বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎখচিত ;
রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ।
ছুটে আসে পঙ্গপাল শত্রুর জোয়ার—
ট্যাঙ্ক, মৃত্যুঝলকিত কামান, সওয়ার।
লুব্ধ চোখে ঝল্‌সায় আগুন ;
মাথার ওপর বজ্র,
কঙ্কাল পরায় গ্রন্থি পায়ে।
বিশাল গম্বুজ ভাঙে ;
দেখা দেয় দিগন্তে সবুজ।
প্রাণতুচ্ছ প্রতিজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ রথী—
দাঁড়ায় নগরদুর্গে।
দেশপ্রেম ধমনীতে, বিশ্ববোধ ধ্যানে ;
ক্ষিপ্রগতি পরাক্রান্ত হাতের পরশু।
ফেরে লুব্ধ পশু ;
মিটেছে রাজ্যের ক্ষুধা ;
প্রাণ তার বিশ্বময় মৃত্যু আতঙ্কিত,
স্তালিনগ্রাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর ;
তাই তো নদীর স্রোতে, অগ্নিদগ্ধ মাঠে
মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ স্বাক্ষর।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শান্তির মশাল

হাওড়া ব্রিজে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সূর্য গুলিবেঁধা মানুষের মতো
মিছিলের মানুষের লাল রক্ত কলকাতার সন্ধ্যার আকাশ—
সে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে একমুঠো শপথ
ময়দানে নিলাম তুলে ঊর্ধ্বশিখা শান্তির মশাল।

কতকাল, আর কতকাল
থাকব বল দীপ-নেবা দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে একলা ঘরে বসে?
কতকাল, আর কতকাল
দু'কানে আঙুল দিয়ে বাজের আওয়াজে শুনব
মায়ের বুকফাটা কান্না, একমাত্র ছেলেকে-হারানো?
কতকাল জন্ম নিতে মাথা কুটে ফিরবে বল অহল্যার ভ্রূণ
আমার নিভৃত স্বপ্নে আলোর ঘা দিয়ে?
জানো না আমার রাত্রি, রাতজাগা দু'চোখ
হাত-পা-বাঁধা মুখ-বন্ধ অন্ধকারে ধর্ষিত শান্তির,
মৃত্যুর চিৎকারে-চেরা বুলেটে-বুলেটে ক্ষতবিক্ষত শান্তির
শ্মশানযাত্রার সঙ্গী সন্দেশখালিতে,
তেলেঙ্গানায়?
আর রাত্রি জ্বলেছে দাউদাউ
আমার শান্তির চিতা। দিনগুলো আমার
কেঁপেছে ছাইওড়া পোড়া মাটি, দগ্ধ ধূ-ধূ তেপান্তর···
কতকাল, আর কতকাল?—

আমার অস্তিত্ব ছিল এতকাল একটি প্রশ্ন, আমার আকাশ
আশঙ্কাআহত নীল,
আমার বাতাস
ছিল সে নিশ্বাস চেপে একটি প্রশ্নে, প্রশ্নের ফলায়:
কতকাল, সইব কতকাল?

আমি কি চাইনি তো শান্তি একটুখানি ছাউনির তলায়
দু'বেলা দু'মুঠো অন্নে?
তবু কেন কুত্তার উৎপাত?
ভেবেছ খুঁজিনি শান্তি অধ্যয়নে, তপে?
তবু শান্তি কই? তবু অশান্তির উৎপাত কুকুর
আমাকে তাড়িয়ে ফিরল
আমাকে ঘরছাড়া করল
ঘর থেকে রাস্তায় রাস্তায়।
রাস্তায় ময়দানে আজ কখন-যে একজন-দু'জন
শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে-হাজারে আমি
লাখে-লাখে অযুত-নিযুত আমি
বিদেশী দুশমন আর বেইমান কুত্তার দিকে আঙুল দেখাই
আমি পটারি-মজদুর, আমি লায়ালগঞ্জের চাষী শান্তির সৈনিক, আমি
শান্তির মিছিল হাতে শান্তির মশাল মুখে শান্তির আহ্বান:
শান্তি চাই আমি।
জমি চাই, কাজ চাই, এ-জীবনে বাঁচতে চাই
শান্তিতে বাঁচার অধিকার,
শান্তি চাই আমি।
প্রাণখোলা হাসি চাই, প্রাণ চাই, গান চাই
স্বাধীন চিন্তার শান্তি,
শান্তি চাই আমি।
আমার স্বদেশকে চাই, স্বাধীন বাংলাকে চাই,
বাপ-মা-বোনের শান্তি
শান্তি চাই আমি।

লালবাজারে, সরকারি দপ্তরে
চব্বিশ ঘণ্টাই বাজছে পাগলাঘণ্টি, ঝড়ের সংকেত।
ব্যাঙ্কের খাতায় জমা বেইমানির সেলামি, তবুও
লুঠেরা বখরার দিন শেষ, তাই ঝড়ের সংকেত।
লাঠিতে চুরমার মাথা, মুখে রক্ত, ওপ্‌ড়ানো দু'চোখ
তবুও রাস্তার লোক বন্দুক মানছে না, তাই ঝড়ের সংকেত।

বৌবাজারে তক্ষণে রাস্তার দু'ধারে
সারে-সারে জানলা খুলে গেছে :
"এস, শান্তি এস—"
বারান্দায়-বারান্দায় ঝলসানো দু'চোখে
থমকানো শহরে জাগছে দুরন্ত সমুদ্রশাঁখে অহল্যার প্রসবযন্ত্রণা :
"এস, শান্তি এস—"
ততক্ষণে রুদ্ধকণ্ঠে উৎকর্ণ শহর বলছে,
"এস শান্তি এস
এঘরে তোমাকে রাখব আকাশপিদিম জ্বেলে,
এস, শান্তি এস
জানলায় তোমাকে রাখব শান্তির মশাল, এস
এস, শান্তি এস,
এস শান্তি বোসো শান্তি ঘরে-ঘরে থাক শান্তি
এস শান্তি এস।"

কখন কলকাতা নিল হাতে তুলে শান্তির মশাল।
কখন উত্তরধারী টালা দিল শান্তিজল,
টালিগঞ্জ দিল
দক্ষিণে হাওয়ায় মুখ মুছিয়ে কখন
সমস্ত কলকাতা তুলে নিল শান্তির মশাল।
কখন-যে কলকাতার অলিগলি মোড়ে-মোড়ে ওত্‌পাতা গোয়েন্দা থাবার
নির্লজ্জ নখেরা এল বেরিয়ে আলোর বাইরে—
হ্যারিসন রোডে
হঠাৎ পেছনে দেখছি, নিঃশব্দে মরিয়া
গুটিগুটি আসছে হিংস্র জিপে-ট্রাকে মানুষশিকারী।
"রোখো, অন্ধকার রোখো" তবু বলছে সুখ-স্বপ্ন-শান্তির মশাল তুলে
লতিকা সেনের ছেলে কিশোর কলকাতা,
আব্‌দুস সালাম যাকে সপ্রেম রক্তের টিপ পরিয়েছে, সেই
মোহিনী কলকাতা ডাকছে শান্তির মশাল তুলে
"রোখো অন্ধকার"।

"বোমারুর ছায়া, কালো ধোঁয়ার আড়াল ছিঁড়ে
আকাশ শিয়রে এস
রোখো অন্ধকার,
ডলার-ডঙ্কায় শ্বাসরুদ্ধ হাওয়া, বও বও
বুকভরা বাতাস বও
রোখো অন্ধকার,
নাগিনীর নিশ্বাসের বিষাক্ত আওয়াজ দাও
ডুবিয়ে ভৈরবী ভৈরোঁ।
রোখো অন্ধকার,
রোখো, অন্ধকার রোখো, উত্তর দক্ষিণে রোখো,
পূবে ও পশ্চিমে রোখো—" ডাকছে-যে কলকাতা।
উদ্বাস্তু কলকাতা ডাকছে মালয়ের হুঁশিয়ার কামিনের গান,
প্রচণ্ড কলকাতা ডাকছে চীনের চাষীর ডাক, উদাত্ত উইক্রেন,
অহল্যার মরা ছেলে মা বলে ডাকছে-যে আজ—
ডাকছে-যে কলকাতা।

হাওড়া ব্রিজে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সূর্য গুলিবেঁধা মানুষের মতো,
মিছিলের মানুষের চাপ-চাপ কালো রক্ত রাত্রের আকাশ—
সে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে একমুঠো শপথ
কলকাতাকে তুলে ধরি উর্ধ্বশিখা শান্তির মশাল।

পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য

এত গোলমাল কিসের জন্য

ঝর্ণার তোড়ে, পাহাড়ী হাওয়ায়
যন্ত্রের চাকা কে আর ঘোরায়
ঘানি বা মাড়াই কলের চাকায়
সে কাজ বলদ যদি বা চালায়,
বাষ্প, বিজলি যদি তা বাড়ায়,
পরমাণু তেজ যদি তাই চায়?

শুধু সকলের ভালোর জন্যে
শান্তি খুঁজতে ছিলাম হন্যে।
রূপকথাটির এ-রাজকন্যে
ডাইনীর হাতে যায় উচ্ছন্নে,
মরবে ডাইনী, মেরে অগণ্যে!
এতটা এলাম কিসের জন্যে?

রাম বসু

যুদ্ধ ও শান্তি

এক

আরাকানের ভিজে অন্ধকারে আরণ্যক হাঁক
পৃথিবীর পাথর পাঁজর কাঁপিয়ে গুমরে ওঠে,
ক্ষিপ্রগতি বাতাসের পিঠে অন্ধকার নৃশংস তৈমুর,
রক্ত আর কান্নার ভেতর দিগ্বিজয়ী
আর মৃতবৎসার মত অরণ্যের আর্তনাদ—
আমাদের ভয় লাগে
আমরা কি তবে ফিরে যাব অসহায় বন্যতায়
মানুষ কি শুধুই তবে প্রবৃত্তির আদিম সমষ্টি?
আমাদের ভয় লাগে

এখনো কি কেউ বেঁচে আছে
বেঁচে আছে লঙরখানার ধারে
পড়ে আছে কঙ্কাল করোটি
যার গায়ে সময়ের শ্যাওলা?
আজ কোন্ ভাষায় কথা বলে
কথা বলে সজল হাওয়ায় হাত নেড়ে
সাঁওতাল যুবতীর ধবধবে সন্তান
তার নীল চোখ বাংলার সবুজ চিনল কি
চিনল কি গ্রামের সলজ্জ রমণী হাই বুট আর উগ্র শিস্?

হে প্রবীণ অন্ধকার, হে ধ্যান-মৌন মহাকাশ
তাদের হাত ধরে নিয়ে এস
নিয়ে এস শহরের ভিড়ে আর গ্রামের নির্জনে
সময়ের মদে যারা অচেতন, তারা একবার কেঁপে উঠুক
হে অন্ধকার হে মহামৌন মহাকাশ।

দুই

দেখ দেখ পাহাড়ের মাথার উপর রূপবতী রাত
শিকড় পাথরের অমৃত-আঁধার মেখে দেবদারুর দুর্বোধ্য সঙ্গীত
চিরকাল পাশাপাশি বশিষ্ঠ আর অরুন্ধতী তারা
আমরাও তেমন ভাবে জ্বলি, জ্বলি মাঝখানে মাটির টানে
আমাদের চাপা চাপা কথার কাকলিতে মহামৌন মহাকাশ
কী এক নিবিড় অপ্রাপ্তিতে ধ্যান ভেঙে চমকে ওঠে
আমরা অকারণে হাসি আর সঙ্গে সঙ্গে তারাগুলো জ্বলে।

আমাদের ভাল লাগে
তোমার চোখের দিকে অপলক তাকাই
প্রাচীন গবাক্ষ থেকে দূর গৌড়ের মাটির দিকে যেন—
আমাদের ভাল লাগে
দৈন্য আর যন্ত্রণাকে কাঁধে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চাইতে
যেমন ভাল লাগে প্রখর দুপুরে জলার ঘ্রাণ নিতে।

কিন্তু একটা বিস্ফোরণ
আমাদের স্বপ্ন চিন্তা চেষ্টার মৃত্যু
ঘামে শ্রমে রূপসী পৃথিবী একমুঠো ছাই—
আমাদের ভয়াবহ পরিণতি।

আমরা যুদ্ধ চাই না।

আজ যদি এক ঝলক রক্ত ঝরে
কাঁটা-তারের ওপর সঙীন কথা বলে
আজ যদি হত্যার চিৎকার ওঠে—
ভেবো, সে আক্রমণ মানুষের হৃৎপিণ্ডের দিকে
ভেবো, সে জল্লাদ সূর্যের আততায়ী।

তিন

কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাতায় রোদের চমক
শিশু হাসে, নদী কথা বলে যেন
ফেটে পড়ে বেল আর জুঁই
আমরা দেখি আমাদের প্রতিবিম্ব
আমরা শান্তি চাই

যারা পৃথিবীকে ভালবাসে
তাদের মুখে পৃথিবীর রূপ—
পাঁচটা আঙুলে পাঁচটা নদীর গান
মানুষ চিরকালের অশান্ত সমুদ্র
এক একটা ইচ্ছা এক একটা ফেনচূড় তরঙ্গ
আষাঢ়ের প্রত্যাশিত মাঠে একমুঠো বীজ
আশ্বিনের সকালে পাকা সোনার ঢেউ
আমরা অনেক

নিশ্চয় ও নিঃসন্দিগ্ধ মাটির ওপর আমাদের আরম্ভ
আমাদের আরম্ভ ভালবাসায়
আমাদের সূচনা ইতিহাসের সূচনা
মানুষ মানুষকে ভয় করবে না—
কবিতা চিরকাল মানুষকে মহান করে
শিল্প চিরকাল পৃথিবী সাজায়
আমাদের যুগ তার সমুদ্র স্বর

আমি তোমাকে গান দিলাম, বসন্তের পল্লব দিলাম
আমি তোমাকে নদী দিলাম, দিগন্তের উত্তাপ দিলাম
তোমাকে দেব নিরুপদ্রব সাধনার ঠাঁই, উজ্জল সকাল
তুমি আমাকে ভালবাসা দিও
দিও শিশির কপালে পারিজাত।

কৃষ্ণ ধর

রণদানবকে, না

শিয়র জুড়ে যমের দোসর
যতই বাড়াক হাঁ
যম দুয়ারে দিচ্ছি কাঁটা
দানব হটে যা ॥

ভাঙবো ডানা মোচড় দিয়ে
মিশাইল ভেঙে কাস্তে
তূণীর ছেঁটে বানায় মানুষ
দোলনা ভালবাসতে।

রুখবে মানুষ ক্ষেপণাস্ত্র
রুখবে তারার যুদ্ধ
পাঁচ মহাদেশ জুড়ে মানুষ
শান্তিতে উদ্বুদ্ধ ॥

ধনঞ্জয় দাশ

এসো শান্তির কপোত

কে এলে, কে এলে আজ সাম্রাজ্য-স্বার্থের এই
শ্মশান-চিতার দেশে,
অনাহারী বিলাপের একটানা যন্ত্রণার
হাহাকার ভরা এই এ-দেশে আমার, কে এলে ?

কে এলে এখানে আজ শান্তির মশাল জ্বেলে
মুঠো মুঠো গান নিয়ে, আশ্বিনের আলো নিয়ে
নিয়ে প্রাণ প্রেমের পসরা
সসাগরা পৃথিবীর সোনালী শস্যের মাঠে কে এলে এখন ?
কবরের বুক খুঁড়ে কঙ্কাল-করোটি তুলে
কে এলে আমার দেশে
শান্তির মঙ্গলমন্ত্র পাঠ ক'রে
হাতে হাতে গুঁজে দিয়ে নতুন জীবন
কে তুমি এখানে এলে জ্বল জ্বল ঊর্ধ্বশিখা প্রেমের মতন ?

সত্যিই তুমি কি এলে ?
দোলনায় দোল খাওয়া আমার শিশুর ঠোঁটে
টুকটুকে হাসি হয়ে, ধুকধুক প্রাণে তার সুধার নির্ঝর হয়ে
সত্যিই তুমি কি এলে ?
তুমি কি সত্যিই এলে লজ্জাকে দু-হাতে ঠেলে
দুঃশাসন অরি হয়ে রাত্রি শেষে
এখানে বিবস্ত্রা এই দ্রৌপদীর দেশে ?
সত্যিই তুমি কি এলে রূপসা নদীর বাঁকে আকালে নাকাল হওয়া
ঘুঘু-ডাকা এ-গাঁয়ের কিষাণ কন্যার চোখে
নবান্নের স্বপ্ন হয়ে, ঝাঁপবন্ধ ঘরে ঘরে এখানে এবার ?
তুমি কি সত্যিই এলে বুলেট-বিদীর্ণ বুক কিশোর কুঁড়ির দেশে
ফুলের সুরভি হয়ে
সুখে-দুখে সমব্যথী সগর-সন্তান হয়ে
সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনার ছলছল্ প্রাণের কল্লোল হয়ে
মেহনতী মজুরের মৃত চোখে আশা হয়ে, এ-দেশে আমার ?

তবে এসো, তোমাকে বসাই আজ জারুল-জামের ছায়ে
আমার ঘরের এই
পরিপাটি মাটির মমতা-মাখা নিকানো দাওয়ায়
তবে এসো, তোমাকে বন্দী করি
বন্ধুর সততা দিয়ে শান্তিকামী মনের খাঁচায় ॥

তুমি তো শান্তির দূত :
দিশাহীন হতাশার হাহুতাশ অন্ধকারে
অনন্ত জিজ্ঞাসা তুমি
অশ্রুমতি সাগরের অথৈ পাথারে তুমি
দ্বীপের আকৃতিসম তুমি এক নতুন পৃথিবী।
তোমার উচ্ছল উৎস প্যারিসের মধ্যাহ্ন প্রহর
পাথরে-দেয়ালে বাঁধা, প্রহরী বেষ্টিত তুমি তবু কী উদ্দাম!
হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়া যৌবন-জোয়ারে জাগা
তুমি তো ফেরারী কবি শান্তিসেনা নেরুদার গান।

তুমি এলে, ছাখো ছাখো, যুদ্ধের ঈগল ছাখো
পাখসাট্ পাখার ঝাপটে ছাখো,
আতঙ্কে কাঁপছে ছাখো
থরো থরো ডলার-ডঙ্কার দেশে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শয্যায়।
তুমি এলে, ছাখো ছাখো ইতালী উজ্জ্বল হলো
আঙুর-ঝরানো ক্ষেত আলুথালু আবেশ বিহ্বল হলো
তরুণ-তরুণী চোখে সভা হলো সোনালী সন্ধ্যায়।
তুমি এলে, ছাখো ছাখো মস্কো মুখর হলো
শ্বাসরুদ্ধ মনের কিনারগুলো বিদ্যুৎ-নিশানা পেলো
মোড়ে মোড়ে মহড়ায় অযুত শান্তির মন
শাণিত কৃপাণ হলো বিক্ষোভ-ব্যথায়।

তুমি এলে, কোরিয়ার তীর বেয়ে রক্তনদী পাড়ি দিয়ে
ইয়েনান—নানকিং-এ সকাল ছড়িয়ে দিয়ে
লবঙ্গলতার দেশ দারুচিনি বনে বনে
সিংহল-মালয়-ব্রহ্মে অগ্নিগর্ভ সূর্যের আভায়,
তুমি এলে অবশেষে সব দেশ পাড়ি দিয়ে
বিচিত্র আমার দেশে জ্বালামুখী হৃদয়ের জ্বলন্ত জ্বালায়।
এসো তুমি, শুচি-শুভ্র শান্তির কপোত তুমি
এসো আজ, তোমাকে বন্দনা করি

হাজার হাজার সই কাজল কালির টিপে
রক্তের তিলক এঁকে
আশার দিগন্তে জাগা প্রতিরোধী প্রতিজ্ঞায় আসন্ন সংগ্রামে
গ্রামে-গঞ্জে ঘরে ঘরে এসো তুমি, এসো আজ
তোমাকে বন্দী করি শিল্পীবন্ধু প্রাণবন্ত পিকাসোর-নামে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ঝড় আসছে

এই-যে শুনছেন,
এখন উঠে বসুন ;
ঝড় আসছে !

ঝড় যখন আসে
প্রকাণ্ড ওই অশ্বত্থ গাছটাও
কেঁপে ওঠে,
পাতাগুলোর ভেতর দিয়ে
হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ ;
মাঠে-মাঠে ধূলোর আবর্ত
হঠাৎ বিশাল সাপের মতো
কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে।

নদীর শরীরেও
নেচে ওঠে বাঁধভাঙার উল্লাস ;
দূর দিগন্ত ছেয়ে
মেঘে-ফোলা আকাশ-নীলিমায়
থেকে-থেকেই এক-একটা
বিদ্যুৎ ভ্রুকুটি।

এই-যে শুনছেন
ঝড় আসছে ক্রমশ এগিয়ে
এখন উঠে বসুন।

ঝড়ের লক্ষণ এখন
সমস্ত পৃথিবীর অঙ্গ জুড়ে ;
সত্তর-বছুরে হাবড়া-বুড়ো শকুনি – পাক্কা অভিনেতা।
হাজার ক্ষেপনাস্ত্রের ঘুঁটি বাগিয়ে
কপট পাশায় প্রস্তুত ;
তার বিশ্বাস কুরুক্ষেত্র শিয়রে ডেকে
ফলন্ত জীবনকে ঠেকাতে পারবে সে।

ঝড় আসছে, শুনছেন ?
এখন উঠুন।

শুনছেন ?

বিতোষ আচার্য
শান্তি পদযাত্রা ১৯৮২

পদশব্দে সাড়া পড়ে, অন্ধকার ছেঁড়াকোটা, ফিকে
দিকে দিকে
সংস্কার-প্রাকার ভাঙা, গুঁড়োগুঁড়োপাথুরে সংশয়
ধুলো হয় :
স্টকহোম থেকে টুরকু, হেলসিঙ্কির পথে
অসলো থেকে মস্কো, মিনস্ক
শান্তির পতাকা ওড়ে
আপামর মানুষের ঝড়ে
তিনশোয় শুরু হয়ে হাজার হাজার
শেষে লাখ...

বিস্তৃত ভূভাগ ব্যেপে যেন বাজে শাঁখ :
শ্বেত-পারাবত ওড়ে, নেড়া গাছে
পাতা এসে
সবুজের বান
দামাল হাওয়ায় ভাসে
মৃত্যুঞ্জয় মানুষের গান
শুধু গান……

কলকাতার ছেলে
—নিত্য যার সতেজ ফুসফুস
কুরে খায় অপুষ্টি-অসুখ
কলকাতার লোক
—ন্যুব্জ পিঠে বোঝার পাহাড
পায়ে দলে শাদা শাদা হাড়
পার হয় বিষাদের নদী
অথচ, হৃদয়জোড়া বিশাল আকাশে
স্থিরছায়া দেখার প্রত্যাশী যারা
উজ্জীবিত তারা গান শুনে
হাতে হাতে ইস্তাহার গুঁজে
দেয় পাড়ি, কে জানে কোথায়
শান্তির কপোত-আঁকা পতাকা দোলায়
অবাক চলনে-চল নামে, কলেবর স্ফীত হয়
যতো যায়…
অবিচল-সংকল্পে, আলাপে বোল ফুটে
কলকাতার ভূভাগ চমকায় ॥

সিদ্ধেশ্বর সেন

তুমি কোনো যুদ্ধ শুরু করনি

তুমি কোনো যুদ্ধ শুরু করনি
তুমি শুরু করতে চেয়েছিলে শান্তি
তোমার সহজ শান্তি

তুমি চেয়েছিলে, হে প্রভাত স্নিগ্ধতার দেশ!
প্রতিদিন সূর্যকে উপহার দেবে
তোমার বসন্তের রক্তকুসুম, আর
শিশুর হাসি

কিন্তু, আজ প্রতিদিন
সূর্য তোমার আলোক থেকে
মুখ লুকিয়ে
পালিয়ে বেড়ায়
কেননা তোমার বাগানে
আজ যে একটিও কুঁড়ি
জেগে নেই

তার বদলে জেগে রয়েছে রক্ত
কুঁড়ির মতো টকটকে রক্ত
তার বদলে শিশুদের মৃত চোখ,
নিষ্পলক, নিহত চোখ

তার বদলে মৃত্যু ও আর্তনাদ
মৃত্যু ও আর্তনাদ

বরফের প্রান্তরে শয়তানের প্রেত-পদধ্বনি

কে তোমাকে এই ধ্বংস দিল,
বল, কে তোমার সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে
দিল নরকের তাপ, যন্ত্রণা?

২

কোরিয়া। তোমার খণ্ডিত ভাগ্যের
দুই বিপরীত মুখ
: পিয়ঙইয়াঙ আর সিউল
সিউল আর পিয়ঙইয়াঙ

পিয়ঙইয়াঙ যখন তার
প্রেমের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখছিল,

পিয়ঙইয়াঙ যখন তার
সৌভ্রাত্রের চোখ দিয়ে পৃথিবীর
মানুষের সৌভ্রাত্র জয় করছিল,

পিয়ঙইয়াঙ যখন তার
মুক্ত চোখ নিয়ে পৃথিবীর
মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করছিল,

সিউল তখন দিন গুণছিল,
সিউল তখন ওয়াশিংটন আর
হোআইট-হলের তকমা আঁটা বকলস
গলায় জুৎ করে বেঁধে নিচ্ছিল,
সিউল তখন তার মনিবের
ছুঁড়ে-দেওয়া মাংসের টুকরোয়
কামড় বসাচ্ছিল,

সিউল তখন তার
প্রভুর চারপাশে ঘুরে ঘুরে
মাটিতে গন্ধ শুঁকছিল

নরকের দ্বাররক্ষী সিংমান রী,
তখনও সে জানত না তার
পরিণাম

আজ সে তার নিজের রক্তে
নিজের বীভৎস মুখ দেখে
যদি আঁতকে ওঠে

তবু কেউ তার জন্যে এক ফোঁটা
১ করুণা ফেলে দেবে না,
তবু প্রত্যেকে তার নাম
মুখে নিতে ঘৃণায় রি রি করে উঠবে।

৩

আমেরিকা
এ সবের জন্যে আমি
তোমাকে দায়ী করছি,
তোমাকে নয়
তোমার স্তম্ভিত ঐশ্বর্যের তলায়
ওয়াল স্ট্রীটের সুড়ঙ্গে,
ষড়যন্ত্রের ডাকিনী আলোয়
যে কয়েকটা অন্ধকারের জীব
তোমার মানুষের ভাগ্য নিয়ে
জুয়ো খেলছে,
আমি দায়ী করছি তাদের।

হত্যা ও রক্তের যে বদ্ধ গুহামুখ
তারা নিজেরাই খুলে ধরেছে,
তার মধ্যে আমি তাদের বিনাশ
দেখতে চাই।

পিয়ঙইয়াঙ আগুনে ঝলসে যেতে পারে
কিন্তু কোরিয়া ধ্বংস হয় না,
পিয়ঙইয়াঙ মাটিতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকতে পারে
কিন্তু কোরিয়া ধ্বংস হয় না।

পুসানের সাঁজোয়া বহরে না
পানপুনজনের বাঁধাবুলির আড়ালে না
কোরিয়ার মাটিতে মৃত্যুর পতঙ্গ
হেঁটে বেড়ালেও না

দুর্ধর্ষ-সুন্দর কোরিয়া!
উন্মুক্ত স্বাধীন মৃত্যুহীন কোরিয়া!

তার দিকে বাহু মেলে দেয়
পাঁচ আঙুলে গাঁথা পৃথিবীর পাঁচ মহাদেশ
মানুষ, মানুষ
তোমারও দেশের, আমেরিকা!

ট্রুমানের রক্তমাখা হাত যারা ধরে
সেই সব নোংরা হাত নয়,
(তেমন হাত আমার দেশেও আছে)

কোরিয়ার জন্যে বুক পেতে দাঁড়ায়
উত্তরের স্বর্গতোরণের সন্তান,
চীন মহাভূমির অপ্রতিহত সন্তান

কোরিয়ার জন্যে বুক বেঁধে এগোই
আমি,
অবিচল হিম অদ্রি আর
উত্তোলিত ভারতসমুদ্রের সন্তান।

দেশে-দেশে নদী, উপত্যকা,
গিরিবর্ত্মে
যতদিন
তোমার একটিও ছায়া ঘুরে বেড়াবে
আততায়ী!

ততদিন আমি তোমার সন্ধান করে
ফিরব,
ততদিন আমি থাকব
আদিম ঝঞ্ঝার মতো ক্ষুব্ধ
ভয়ঙ্কর
তোমার অপরাহত শত্রু ॥

মৃগাঙ্ক রায়

আমাকে খাচ্ছে

বৃষ্টির প্রবল শব্দ
মাটি চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে,
কেঁপে কেঁপে উঠছে পাললিক ত্বকের
মাইল মাইল আতুর অন্ধকার ;
জল নামছে
বুড়ো মানুষের তোবড়ানো মুখের
লোল কষের মত
মাটির ফাটল বেয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে জল—
আমার পচা মাংসের রোমকূপ ভেদ ক'রে
শিরাউপশিরা স্নায়ু আর সাদা হাড় ভিজিয়ে
জল নামছে।
পৃথিবীর আকাশ জুড়ে
ও কি বর্ষাকাল তবে ?   ও কি আষাঢ় ?

হাজার হাজার গাছের শিকড়
খসখসে জিভ দিয়ে
চাটছে আমাকে, আমার চামড়ার নিচে
অসংখ্য পোকার দাঁত।

ওরা আমাকে খাচ্ছে
আমার জমাট-বাধা রক্তের মধ্যে
মাংসের মধ্যে, চোখের মণির মধ্যে
হাঁটছে
ছিঁড়ছে আমাকে
চিবোচ্ছে, টুকরো টুকরো ক'রে
খাচ্ছে ॥

সুধাংশু সেন

আগুন নেভানোর জন্যে

আমার মেয়ে চুপচাপ চেয়ে থাকে
সন্ধ্যামণি ফুলের মতো
আমার ছেলে একা-একা হেঁটে যায়
নিমগাছের ছায়ায়
আর চেয়ে দেখে
তেড়ে আসছে আগুনের ইশারা
রক্তমাখা বাঘছাল গায়ে
চৈত্রের সন্ত্রাস।

শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এতো সন্দিগ্ধ বাতাসে
তেজস্ক্রিয় ঘেরটোপের ভিতর
ঘাসের সংসারে আধপোড়া ঘাস হয়ে
আছি প্রেমে ও বিষাদে
মাটির রোমকূপে আছি
এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে
আকাশের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া.
তারাদের নীলদেশে মাঝে মাঝে ধাতব চিৎকার
আমার স্বদেশে স্বপ্নের কাছাকাছি
এখনো জীবন

অথচ চিমনির গা বেয়ে নামছে
আগুনের রস মুখে গায়ে জিভের ডগায়
আর কেৎলির ঢাকনাখোলা মরা মানুষের
ফুসফুস টগবগ করছে :
আমরা তো এই মৃত্যু চাইনি কখনো
সময়, তুমি তা জানো
অনেক দুঃখের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর দুঃখ
অস্থিপঞ্জরে বিষ
নাগাসাকি হিরোশিমা জানে।

হৃদয় আর আগুনের মাঝখানে
দাঁড়িয়ে রয়েছি
আমার স্ত্রী ছেঁড়া কাঁথায় ফোঁড় দিয়ে পদ্ম তুলছে
আমার ছেলের চিবুকের ভাঁজ ক্রমশ দৃঢ়
সুগন্ধী এলাচদানার ভিতর আমার মেয়ে
স্খলিত জ্যোছনায়
পিষ্ট হয়ে ঝরে যায় কবিতার বয়স
আ-ফলা মাঠের দিকে চেয়ে
আমার বৃদ্ধ পিতা
যিনি বটের ঝুরির মতো মাটি আঁকড়ে আছেন
চোখ থেকে সাদা কাঁচ নামিয়ে বললেন—
চিনে নে এবারে
অন্ধকার ফালা ফালা করে
মুক্তোয় বাঁধানো দাঁত শত্রু মুখোশ খুলে হাসে।

আগুন নেভানোর জন্যে
আমার মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে রেখেছে
আমার ছেলে একদা একটি বাগানে
গোলাপ চারা পুঁতবে বলে জড়ো করে রেখেছে
ক্ষার ছাই॥

গোপাল পাল

গ্যাগ্যারিণের পায়রা

When I flew around the earth in a spaceship, 1 saw how beautiful this planet is. Let us preserve and increase this beauty, not destroy it.

—**Yuri Gagarin**

তুমি যখন মহাশূন্য মেনোলোভা, আকাশ বিহঙ্গ থেকে
সবুজ পৃথিবীকে সুন্দর দেখে
তাকে আরো সুন্দর করার শপথ গ্রহণ কর্‌ছিলে
ঠিক তনখই
আমার জীর্ণ ছাদের উপর কেউ যেন ছড়িয়ে রেখেছিল
সোনালী রঙের গম।

অনুচ্ছিষ্ট ঈশ্বরের অসংখ্য পায়রা—
যারা পরিবার পরিকল্পনা জানে না
জানে না উদ্বৃত্ত কাকে বলে, অথবা সঞ্চয়,
তারা মহানন্দে গমকণা খুঁটে চলেছিল।

আমি তখন শিখ্‌তেই ব্যস্ত ছিলাম
কাকে বলে উদ্বৃত্ত, কাকে বলে কলাকৌশল :
আর শিখ্‌তে শিখ্‌তে দেখলাম
আকাশ ছোটো হচ্ছে, পৃথিবী ছোটো হচ্ছে
আমাদের উঠোন ছোটো হ'তে হ'তে
ঘরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে রাস্তা।

জীর্ণ এবং নতুন ছাদের পার্থক্য জেনে
জনসংখ্যার তুলনায় ভূমি কম জেনে
আমার রক্তের মধ্যে ক্রমবর্ধমান 'বিপন্ন বিস্ময়'

কিন্তু যে উড়্‌তে পারে তার আকাশ
আমাদের আকাশের চেয়ে অনেক বড়ো—

এবং পায়রা, শান্তির পায়রা, ভালবাসার পায়রা
মনে মনে সঙ্গোপনে
পৃথিবীর পথে চিরকাল নাচে
নিবিড় নীরব নিথৈ সুখে।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

এক যুদ্ধের গল্প

একটা পুরোনো গল্প থেকে গল্পটা ধার করা।
মোড়ল বল্‌ল—যারা শান্তি চাও তারা সব
দক্ষিণে যাও। ঝগড়াবিবাদ খুনোখুনির
পক্ষে যারা তারা সব উত্তরে। আমি জানতে চাই কে কোথায় আছে!

দেখতে দেখতে উত্তর ধূ ধূ মাঠ। মাঠ পেরিয়ে
নদী, নদী পেরিয়ে জঙ্গল, কোথাও জনপ্রাণী
নেই। ওদিকে দক্ষিণে মাথার পাশে মাথা,
তার পাশে মাথা। ছেলে কোলে মা,
কিষাণের হাত ধরে কিষাণী, শ্রেষ্ঠী থেকে
ঝাড়ুদার, প্রবঞ্চক থেকে সন্ন্যাসী,
শাকাহারী থেকে মাংসাশী। শিকলে বাঁধা
ঈগল কাঁধে বসিয়ে স্বয়ং যক্ষপুরীর
রাজাও।

মোড়ল কপালে হাত তুলে একচোখ ছোট করে
সেই জনসমুদ্র মেপে নিল। তারপর বাতাসে
চাবুক হাঁকড়ে বজ্রের হুঙ্কারে বল্‌ল—শান্তিকামীদের
মধ্যে সূঁচ হয়ে ঢোকার নাম যুদ্ধ। এই মতলববাজদের
তোমরা চিহ্নিত কর।

মোড়লের গমগমে কণ্ঠস্বরকে লুফে নিল
ডাকহরকরা হাওয়া, চারিয়ে গেল জনসমুদ্রে।
কণ্ঠস্বর ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় ফসফরাসের মুকুট।
মোড়লের ঠিক মাথার উপরে একটা জলন্ত তারা
ছিটিয়ে দিচ্ছে ঠাণ্ডা আগুন। সেই অসহ্য আলো
সইতে না পেরে কিছু লোক পিছলে বেরিয়ে এল
সমাবেশ থেকে। তাদের আঙুলের ডগায় এবার
জেগে উঠল বল্লমের মত নখ, জিভ চিরে
দুভাগ, চোখ ধ্বকধ্বকে আগুনের ভাঁটা। আকাশ
কাঁপিয়ে বাজ পড়ল সমবেত ধিক্কারের। ওরা
ভেসে যাচ্ছে, ওরা পালাচ্ছে!

মোড়লের গলায় এখন বাসন্তী জ্যোৎস্নার ঢল।
সেই প্রশান্ত কণ্ঠস্বর ঘোষণা করল—এটাও যুদ্ধ,
তবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

মিহির ঘোষদস্তিদার

ঘ্রাণ নেব হাসনুহানার

নিরাপদে দিব্বি আছ সুড়ঙ্গে পালিয়ে।

মাটির সুড়ঙ্গে বসে শ্মশান পিশাচ
দণ্ডে মরো চিরকাল। হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস
সঙ্গী হোক। সঙ্গী হোক প্রাণহীন অপার্থিব কিছু—
করোটি-কংকাল-স্তূপে সারাদিন কেটে গেল বুঝি
তবুও পেলে না খুঁজে প্রিয়তম কোন এক মুখ
যার জন্যে একদিন সব কিছু দিতে তুমি ছিলে যে প্রস্তুত।
বৃথা খোঁজা, কাকে পাবে তুমি?
অসীম ঘৃণায় ভাখো ফিরিয়ে নিয়েছে তার মুখ।

করোটি-কংকালে যদি বয়ে যেত হাওয়া
তবে তার বিষবাষ্পে দগ্ধে যেত সর্বদেহখানি
বিকৃত পচন আর পোড়া গন্ধে নিশ্চিত উন্মাদ—
ঝাঁপ দিতে জলে যেতে নিজ হাতে নিজ প্রাণ নিতে ;
কিন্তু বৃথা, বৃথা এই মৃত্যু-চেষ্টা শ্মশান-পিশাচ
তুমি বেঁচে থাকো। বেঁচে থেকে চিরকাল আগলে আগলে ফেরো মড়া
নোংরা পুতিগন্ধময় অন্ধকার হোক পৃথিবী।
ঐ যে সুন্দরী বৌ এইমাত্র মরে ঢলে পড়ে গেল তোমার সাজানো ড্রয়িং-রুমে
সে যে তোমার আপনজন, পুত্রবধূ—তুমি তো তা জানো ভাল করে—
মৃত মার স্তনে মুখ দিয়ে কে ঘুমায় মৃত শব হয়ে
সেই শিশুটিকে চেনো নাকি শ্মশান-পিশাচ ?
দ্যাখো, দ্যাখো, এখনো চলেছে বেজে রেডিও-তে মুন-লাইট-সোনাটা
টেবিলে ফুলের গুচ্ছ সত্ত তাজা মনে হয়
হাসনুহানা কি ? জুঁই-চাঁপা বুঝি ?
একটু সময় দাও, কিছুক্ষণ ঘ্রাণ নেব হাসনুহানার
তারপর যত পারো ফের ফেলো নিউট্রন-বোমা, শ্মশান-পিশাচ।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

অণুপারমাণবিক রক্তে

[মানুষের স্বাধীনতা না থাকলে লেখকের স্বাধীনতা থাকবে কি করে ? কেউ তো ক্রীতদাসের জন্য লেখে না। এক একটা সময় আসে, যখন লেখনীকে স্তব্ধ করে লেখককে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয়। লিখতে চাওয়ার অর্থ একদিক থেকে স্বাধীনতাকেই চাওয়া। —জাঁ পল সার্ত্র]

ভাবনার ভিতরে ছিল ভালোবাসা।
ভালোবাসার মধ্যে ছিলে বিস্তারিত তুমি। তোমারই
কেন্দ্রে ছিল ঘুমন্ত সন্তান···
কি আশ্চর্য আনন্দে মিলনে—
আমাদের উত্তরকাল!

আমরা এ-ওকে ছুঁয়ে দেখি
কি অদ্ভুত রূপোলি বিদ্যুৎ···
ছুঁতে ছুঁতে নিজেদের মধ্যে চলে যাই
হর্ষে মরে যাই আমরা শিহরণে আনন্দে মিলনে, আর
কোমল বিস্ফোরণের মতো
এক-একটি শিশুর জন্ম হয়।
তাদের খেলা করতে দেখি শান্তিবিশ্বাসের
ভোরসকালে।
নাম দিতে হয়, দিলাম—
কোরিয়া, কিউবা, ভিয়েৎনাম, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ
আরো কত কি!

এদিকে যে
আমার আর তোমার ভালবাসার নির্জনে নির্মিত শিশুরা

আমাদেরই অরণ্যে লুকোনো
ভয়ঙ্কর সুন্দর যুদ্ধের রক্ত
শিরামাংসে টেনে নিয়ে জন্মেছে—
সেটা খেয়ালও করিনি।
তাদের অণুপরমাণুতে শান্তি আর বিশ্বাস
আগলে রাখার জন্ম তারা যে
একটা শেষ যুদ্ধের মোকাবিলায়
একেবারে রুদ্ধশ্বাসে গেরিলার মতো
আগাপাস্তলা তৈরী হয়ে উঠছে
সেটাও খেয়াল করিনি।

যতো প্রেম ততো প্রেমিকা
যতো ভালোবাসা ততো আপনজন।
একই ভালোবাসায় তাই—
হাজার প্রেমিকার মতো একটি প্রেমে
ঘিরে দাঁড়ায় লক্ষ আপনজন।

কালো কি ফর্সা, তাই ভাবিনি…
নাকমুখচোখ দেখিনি।
আমাদের শিশুরা তো
আমাদেরই যৌবনে প্রস্ফুট লিপ্ত আমাদের সন্তান…
তোমাকে ভালবাসতে শেখার মতোই
প্রথম আর অদ্বিতীয়
তারা প্রত্যেকেই—
অণুপারমাণবিক রক্তে আমাদেরই বাস্তব।

আমরা শুয়েছি শিশুর জন্ম দিতে
শিশুরা শুয়েছে আমাদের কোলে—
সেইসব বুদ্ধ, যিশু, মার্কস, লেনিন
আজ মৃত্যুর পর তো আমাদেরই অমর সন্তান…

আমরা—এই আমি আর তুমি—বারংবার জন্মেছি
আর জন্ম দিয়েছি আদিঅন্ত মহাভারতের রূপকথা।
অণু-পরমাণুতে সূক্ষ্ম…রক্তকণিকায়,
চোখের মণিতে, মস্তিষ্কে, হৃদয়ে
বাহুবেষ্টনে, ভালোবাসায়
তোমারই আদল পেয়েছে এই বাচ্চারা।
এরা অণু-পারমাণবিক বোমাকেও তুচ্ছ ক'রে
কি সহজ সরল সুষমায়
বেড়ে উঠছে হিরোসিমায়-নাগাসাকিতে।

তরতাজা পায়রার ডানায়,
শস্যে, আর
অগুণতি জনতায়
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে
আন্দোলনে
চিরবসন্তের নিশানে…
নিশানায়—
এরা সংখ্যাতীত জনগণের
এক জগৎ গড়ে তুলছে।

এখন, এরা
শুধু পায়েপায়ে হেঁটে গেলেই—
সমস্ত পৃথিবীর
আচরাচর আণবদানবদের মাথা—
গুঁড়িয়ে থেঁৎলে
অন্য এক কস্‌মিক্ ধুলোয় পরিণত হবে।

গোধূলির গেরুয়া আলোয়
প্রসারিত…আসন্ন
সেই দুনিয়ার কথা

তোমার মতোই
সারাক্ষণ আমার চোখ জুড়ে আছে।
আমাদের ইতিহাস ক্রীতদাস নয়।

ভাবলেই সেসব,
যেন—
লেখা হয়ে যায় দীর্ঘতম প্রেমের কবিতা।

---

১) এ্যাটমবোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ: ১৬ই জুলাই ১৯৪৫—আমেরিকার নেভাডার মরুভূমিতে 'জিরো হিল্‌' পাহাড়ে।
২) এবং ২৬শে জুলাই ১৯৪৫-এ প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয় প্রশান্ত মহাসাগরের 'মিনিয়ান' দ্বীপের মার্কিনী ঘাঁটিতে।
৩) আসল আণবিক বোমা প্রথম ফেলা হয়েছিল জাপানের 'হিরোসিমা'য়: ৬ই আগস্ট ১৯৪৫ এর সকাল সওয়া আটটায়—মার্কিনী বি-২৯ বিমান থেকে।
৪) তারপর, জাপানেরই 'নাগাসাকি'-তে আবার…

তরুণ সান্যাল

স্বার্থপরের আত্মকথন

ঠিকতো পায়রাও নয়, শালিখ বা গাঙচিলও নয়,
ফড়িঙ বা প্রজাপতি সব কিছু বাতিল, আর শেষ কথা মানুষও বাতিল,
যুদ্ধ টুদ্ধ যতটুকু ভাবো, কিংবা যে টুকু বীভৎস মনে হয়
তারো ঢের বেশি,
মাটি থেকে রসও বটে, আকাশের গোলে হাল্কানীল
এবং যা নিসর্গেরও, সব অর্থহীন হওয়া, ভবিতব্য তাই,
যুদ্ধের সাফল্য আর অসাফল্য এটুকুই জয়-পরাজয় একই,
শূন্যতায় মিল।
বন্ধুগণ, কথা ছিল তরোয়ালে লাঙল বানাবো

বন্ধুগণ, কথা ছিল একটাই জীবন বলে
জীবনের রসটুকু সুখ দুঃখে তারিয়ে তারিয়ে চেখে যাবো।
এবং বয়সকালে ধীর পায়ে দোপায়া মাঠের পথে
হাঁটতে-হাঁটতে পৌত্র-দৌহিত্রের কাছে আমাদের সময়ের
কাহিনী শোনাব।
বিপ্লবের কথা নিয়ে বিপ্লবীরা ভাবুক, শেখাক,
সেও এক শিল্প, আর শিল্পীতো নিজেই চাষী—
মাঠ তার স্বয়ং মানুষ
এবং মানুষ মানে ফুল পাখি-ইতিহাস-পুরাণ-প্রকৃতি;
শরীরের মাংস থেকে সন্তানও ফোটানো শিল্প,
কিংবা তা শিল্পেরও বড়ো।

আমি ঠিক সোজাসুজি যুদ্ধ তো দেখিনি,
দেখেছি কৈশোরে সেই রাস্তায় রাস্তায় মৃত মানুষের স্তূপ,
মানুষেরই দেহ দুইয়ে সোনা তুলছে স্বদেশে-বিদেশে
ঢের আরেক মানুষ—
তাদেরও বাগানে ফুলে উড়ে বসেছে নির্বোধ মৌমাছি
যেমন লিৎসের মাঠে শিশুদের ভাঙা চোয়ালের হাড়ে একদা বসেছে
আমি কোনো সেন্টিমেণ্ট, ইমোশান, গালগল্প শুনিয়ে বস্তুত
সুড়সুড়ি দিচ্ছি না
বন্ধুগণ, বড় বেশি স্বার্থপর আমি—
এখন পঞ্চাশ বটে, কিন্তু আমি বৃদ্ধ হতে চাই
পাশে চাই গত বিশ বছরের সঙ্গিনীকে,
আমার বৃদ্ধাকে,
তারই রেখা আঁকা মুখে
দাঁতহীন সফল হাসির পৃথিবীতে
পৌত্র-দৌহিত্রের কাছে
বলতে চাই, কোন অগ্নিস্থলি থেকে
কোন ত্রাস, কোন ভীতি থেকে, যুদ্ধ রুখে
তোদের এনেছি॥

শ্যামসুন্দর দে

আর নয় যুদ্ধ

যুদ্ধের দামামা আর নয়কো বাজানো
আর নয় ধ্বংসের বান—
আমরা তো প্রস্তুত, ঘরে ঘরে প্রতিরোধ
সুরে সুরে শান্তির গান।

আমাদের পৃথিবীতে
ধ্বংসের পরাজয়
জীবনের অধিকারে
জন্মের নবজয়।

আমাদের চেতনায়
সবুজের অভিযান
দিনফোটা আলোতেও
পাখিদের কলতান

আমাদের পৃথিবীতে শপথ ভীষণ
হিটলার মুসোলিনী তাইতো কবরে
ক্ষমা নেই ক্ষমা নেই এখানে এখন
গড়েছি শান্তির গান গ্রামে ও নগরে।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সিঁদুরে মেঘের আড়ালে বৃষ্টির শব্দ

যুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীর জন্যে
চোখ ফাটিয়ে জল আনার চেয়ে
এসো আমরা বরং ভাবি
যাতে সর্বনাশ মুক্তিও তাতেই।

আমাদের ঘর পুড়েছে
তবু সিঁদুরে মেঘের আড়ালে বৃষ্টির শব্দ তো শুনতে পাই আমরাই।
রক্ত ঝরলেও
চোখ থেকে জল ঝরে না যেন;
আমাদের ভেতরে রক্তাক্ত ক্ষতটা যেন কিছুতেই শুকোয় না।
ধুলো আর ধোঁয়ায় যখন সবকিছুই মিশ্মার
দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকার চেয়ে
এসো আমরা বরং ভাবি
অনেক বৃষ্টি আর রক্তের ভিতর দিয়ে
দগ্ধানো কাদার তালের মতো পৃথিবীটা
এগিয়ে চলেছে লাল ভোরের দিকেই।
হিম কনকনে ঘরে বসে নষ্ট মানবতার ডিমে দিনরাত্তির তা দিচ্ছে
যে সব বেঁটে ভূতেরা
তীর আর বল্লমের ফসল ফলিয়ে পৃথিবীকে করে তুলছে কাঁটা জর্জর
তাদের কবরে জলন্ত জেরেনিয়ম ফোটাতে
এসো আমরা বরং স্বপ্ন দেখি
গুচ্ছ গুচ্ছ পাকা ফলের
হাওয়ায় নুয়ে পড়া ফসলের,
আর আমাদের ভেতরে মাটির যে দীপ্ত ইন্দ্রজাল স্বপ্ন আছে
তার ছোঁয়ায় আমাদের স্বপ্নকে সফল করে
প্রতিবাদ করি মানবতাবিরোধী যেকোনো হঠকারিতার।

মণীন্দ্র ঘটক

আমরা দেবো না

আপনারা পারেন, যুদ্ধ করুন।
আমরা যুদ্ধ হতে দেবো না।
আমরা যুদ্ধ পারি না, তা নয়
আমরা যুদ্ধের চেয়েও বড় আক্রমণশীল
সে আক্রমণে অজস্র কোটি আণবিক অস্ত্র

অনায়াসে ঘায়েল হতে পারে
অনায়াসে বোমবীরদের হাত-পা-হৃদয় স্তব্ধ হতে পারে
আমরা সেই বড আক্রমণে বিশ্বাসী।

শান্তি যদি বাস্তবিক থাকে—
ঐ সব কোলাহল ঐ সব ডামাডোল
ঐ সব আণবিক উন্নয়ন ধূলিসাৎ হতে কতক্ষণ ?
মৃত্যু আমাদের ভবিষ্যৎ নয়।

বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে
বা, অতীত থেকে বর্তমানে আমাদের জীবন।
বেঁচে থাকার বাঁচিয়ে রাখার স্থলুক-সন্ধান
কোন্ যুদ্ধ দিতে পেরেছে কবে ?
আপনারা পারেন, যুদ্ধ করুন।
আমরা যুদ্ধ হতে দেবো না।।

বাদল ভট্টাচার্য

মানুষ বাঁচতে চায়

মানুষ ছুঁয়েছে চাঁদ, অবারিত জ্যোৎস্নার কুহক ;
মানুষ জেনেছে ধ্রুব হিমাঙ্কের শীর্ষবিন্দু,
তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থলের গভীর।
তাই বুঝি করতলে অসম্ভব শক্তির আধার
স্বোপার্জিত ধ্বংস-বীজ···
ভয়ে ত্রাসে প্রকম্পিত
চিরন্তন পৃথিবীর নৈঃশব্দ্য ত্রাহিমা।

মানুষ বিনষ্ট করে মানুষের নম্র ছায়া
স্থল জল অন্তরীক্ষ-স্থাবর জঙ্গম,

মানুষ বিচ্যুত করে মানুষের মুগ্ধবোধ
অনিবার্য বুকের আরাম…
মানুষের রুদ্ররোষে বিপন্ন এ সারাৎসার
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অবধি।

অথচ সে মহাশক্তি— মহাপ্রাণ ধ্বংসের অতীত
অন্তহীন মায়াবী প্রহর :
চতুর্দিকে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি জুড়ে
তবু থাকে প্রাণকণা অন্তর্লীন নিরবধি কাল…
অপার বিস্ময় ভরা অনন্ত আকাশে
অন্য এক পৃথিবীর জীবাশ্ম প্রতিমা !

অতএব, যুদ্ধ নয়, ধ্বংস নয়, নয় কোন জীবন-বৈক্লব্য :
আজন্মের রক্ত-ঋণে মানুষ থাকতে চায়
মানুষের সাজানো সংসারে
কাঁচ পুঁতি পুতুলের মোহন মায়ায় ;
মানুষ বাঁচতে চায় মানুষের পৃথিবীতে
ঢের দিন—সুদীর্ঘ বছর।

রবীন সুর

তেজস্ক্রিয় ঘেরাটোপ

স্থিতি চাই প্রস্থান ভূমির যথাযথ আবিষ্কারে।
উড়ন্ত খাতায় লেখা এলোমেলো শব্দের ইশারা
ইন্দ্রধনু অক্ষরে ফোটে না ; বোবা তুলি, ঘুমন্ত ক্যামেরা-
চিত্রিত হরিণ অরণ্যের নিরাপদ সীমায় ঝরনায়
পিপাসা মেটাতে এলে ঘোর ক্ষিপ্ত দাঁতাল হুংকার
অনায়াস নাগালের জবুথবু শিকারে ঝাঁপায়।

সিসমোগ্রাফে সংকেত না-দিয়ে ধমনীর দিগ্বিদিকে
চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে স্তরে গুপ্ত আলোড়ন,

কখন কোথায় জাগে ভূমিকম্পে তীব্র জলোচ্ছ্বাসে
এপিসেণ্টারের হদিশ মেলে না, শ্রুতি নেই এণ্টেনার কানে।

নক্ষত্রপল্লীর ছায়া ব্যাপ্ত জলাশয়ে, ছবিগান দীপ্ত সারস্বত।
ধীবর ধৈর্যের জালে ফস্কে যায়। কাদাপাঁক ছেনে
লৌকিক মাছেরা ওঠে, কাঁটা আঁশ উদরসর্বস্ব পুরস্কারে—
আকাশ আকাশে থাকে রত্নাকর অলক্ষ্যে লুকায়।

চোখ নেই তবু নার্কোটিক তন্দ্রার ভিতর
কোথায় কখন
স্বপ্নের সুষমাগুলি সুতৃপ্তির পাখনা ছড়ায়?
ক্রমশ উজান বেয়ে গুণটানা দিন—
কেবল বন্ধন।
মুক্তি নেই মুক্তবন্ধ ছন্দবন্ধে সময়ের পেটুক স্বাকারে!

মৃত্যু কি আটকে থাকে রুদ্ধ ঘরে, শুশ্রূষা কোথায়?
তেজস্ক্রিয় ভস্মমাখা কালো বৃষ্টি, অন্ধকার শুধু অন্ধকার।
চৈতন্যের অভ্যন্তরে যতোদূর দৃষ্টি যায় দিগন্ত অবধি
বিকৃত গর্ভের ভ্রূণ, চতুর্দিকে মর্কুটে উদ্ভিদ…
স্কুলফেরত শিশুদের রক্তবমনের আর্তনাদ,
হিচককের ভয়ংকর মাংসভুক পাখির দাপট
আতঙ্কজাগানো টেলিগ্রামে কোঁকড়ানো স্নায়ুর মানুষ।

পবিত্র অধিকারী
১লা সেপ্টেম্বর

এক একবার মানুষের যাবতীয় ক্রমবিকশিত ইতিহাস, সভ্যতা—
টাল খেতে খেতে ধ্বংসের খুব কিনারে এসে ঠেকে যায়।
এক একবার মানুষের শিকড় শুদ্ধ গাছ
তার ফুল, ফল, পত্রবাহার
জন্মার্জিত জিন থেকে, চন্দনের সমস্ত সৌরভ

সব মূল্যবোধ
টালমাটাল পায়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে
দু'হাত তফাতে
দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে কোনক্রমে, হাতে ফিরে পেয়ে যায় জীবন।
মিছিলের লম্বা সুতোয়, টানা দেওয়া
১লা সেপ্টেম্বর
ধ্বংসের কিনার থেকে
—সে কেবল বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে বলেই
যুদ্ধাশ্বের মুখ।

বিজয়কুমার দত্ত

মানবিক ও পারমাণবিক

যুদ্ধের ভিতরে একদিন শৌর্য ও বীর্যের
অহমিকা ছিল, হোমারের ইলিয়াডে
ব্যাসদেব বিরচিত মহাভারতের
রণচাতুর্যের দীপ্ত ইতিবৃত্ত ঘিরে
মানবিক মহিমার ছিল জয়ধ্বনি।

মৃত্যু কি মহৎ ছিল কুরুক্ষেত্রে, ট্রয়নগরীতে?
তবু, সেই যুদ্ধ ছিল একান্তই সমর-স্বভাবী—
অকারণ লুণ্ঠন ও হত্যার যত কাহিনীর ইতিহাস জানি
তারা সব মহাকাব্যযুগ থেকে সময়ের ঘোরানো চাকায়
ঢের দূরে ছড়ানো ছিটোনো রয়ে গেছে,
প্রাচীন ও মধ্যযুগে পরিচয় তার
মাটিতে রক্তের দাগে, শিলা ও পাথর স্তর ছাড়িয়ে গভীর
অন্ধকারে, মানুষের হাড়গোড়, মাথার খুলির
অতি চেনা চিহ্ন নিয়ে আছে।

পরমাণু যুদ্ধ এক অভিনব মরণ-যজ্ঞের
অবারিত আয়োজন মেলে রাখে আকাশে বাতাসে—
স্থলে জলে নীলিমায় তার
যত ধ্বংস হতে থাকে ব্যাপক বিস্তারে
চিহ্ন তার থাকেনা কিছুই
মানুষ-সমাজ কিংবা সভ্যতার অমোঘ নির্মাণ
এত শূন্য নিরর্থক নিরাকারে নিঃস্ব হয়ে যায়
তাকে আর যুদ্ধ বলে চেনাই যায় না—
সে যেন ভৌতিক এক হানাবাড়ি অলৌকিক স্থাপত্য শরীরে.
নঙর্থক জিজ্ঞাসা চিহ্নের
নিরুত্তর বিভীষিকা পরিণতি পায়

তাকে আজ বন্ধ কর'—পৃথিবীর পুরনো ভূগোল
এখনো স্বপ্নের সাধ, সাধনার প্রতিশ্রুতি চায়
পরমাণবিক ক্রুরতা যখন,
মানুষের হৃদয়কে কুরে কুরে খায়।

শিবশম্ভু পাল
একটি যুদ্ধবিরোধী টপিক্যাল পদ্য

যুদ্ধবিরোধী পদযাত্রাও যুদ্ধ
দক্ষিণে বামে
 মেঘছায়া নামে হিমাচল আসমুদ্র···
 চলো, ঘরে বসে ফরমাশ করি চা
বৃষ্টি পড়ছে, পড়তেই পারে, আকাশ হয়েছে যা।

বায়ুমণ্ডলে স্রোত
বিষুবরেখার
 ভূপ্রান্তে কার লুণ্ঠিত ইজ্জত
 মহাশ্মশানের খসড়ায় মেতে ওঠে—
চলো, ঘুরে আসি, রাত হয়নিকো মোটে।

এভাবেই হোক জয়ন্তী, স্মৃতিসভা
কখনো শিউলি,
চাঁপা, টিউলিপ, কখনো রক্তজবা
লাভক্ষতিহীন নির্দোষ স্বাস্থ্যিকে…
চলি, দেখা হবে, আমি ফিরে যাই বিপরীতে, ডানদিকে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

শেষ চেষ্টা

এতো কম জানি আমি
তবু অনেকে আমার চেয়েও কম জানে।
উজানে ভাঁটায় চলে আলো-অন্ধকার-ভরা অনেক দোটানা।
কখনো বা কিছু ঘটে? মাছ ঘাই দেয়, আর মানুষেরা লক্ষ্য করে
দূর থেকে নৌকো নিয়ে আসে।
আভাসে কিছুটা বোঝা যায়, তা ছাড়া যা থাকে
তা প্লুটোনিয়ামের মতো দীর্ঘদিন ধরে শুধু আগুন ছড়াবে।
মানুষ, পতঙ্গ, পাখি, এখনো যে বেঁচে আছে, সেই এক মস্ত প্রহেলিকা।
শিখা একটাই ছিলো। হে আদিত্য, পূষণ, তোমাকেই শিখা ভাবতাম।
সকালে, ভোরের আগে নাম নিতাম কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি, সেই তো তোমাকে
কখন যে মানুষের তৈরি ছোটো ছোটো আগুনের জিভ
সাপসাপিনীর মতো ছুব্‌লে দিতে আরম্ভ ক'রলো সমস্ত জীবন
তা প্রথমে কিছুই বুঝিনি—এখন বুঝতে পেরেও
দেখি প্রকাণ্ড মথের মতো তেজস্ক্রিয় শীত আমরা পারি কি ঠেকাতে?
হাতে নাতে ঠ'কে যেতে হবে, তবু যতোদিন বাঁচি
এই উশখুশ ক'রে ওঠা শিশির-ছড়ানো পৃথিবীর জমির ওপরে
আরো একটু হেঁটে যাই।
বাঁচাই পাশের লোককে, বাঁচাই আমাকে॥

রমেন আচার্য

মৃত্যুবাণ

['নেশাগ্রস্থদের হাতেই আনবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার।' সংবাদ]

স্বপ্ন ও ভালবাসার অজস্র নীল চিঠি ঝাঁট দিয়ে
টেবিল পরিষ্কার রাখছো তোমরা আর
সেখানে জমছে মৃত্যু ও ষড়যন্ত্রের
জরুরী সব ফাইল।

শিশুদের উচ্ছ্বাস ও কলতানের উপর
কেউ গড়িয়ে দিচ্ছে আতঙ্কের পাহাড়।
পৃথিবীর নরম রোদে হাওয়া ও সূর্যমুখীর
হলুদ ছোটাছুটির উপর ছড়িয়ে দিয়েছে
এক আকাশ হিরোসিমার ছাই।

মদের বোতল ঠোকাঠুকি করে তোমরা গাইছো
মৃত্যু সংগীত।
'মৃত্যু সংগীত'! মৃত্যুর পাশে সংগীত কিভাবে
এসে দাঁড়ায়! আর
আনবিক বোমার ভাণ্ডারে কিভাবে হাসে
একজন শিশুর পিতা, যদি না সে মাতাল হয়।
যদি না সে মাতাল হয়ে ভুলে যায়—হাত বাড়িয়ে
ছুটে আসা শিশুর আলিঙ্গনের চেয়ে প্রিয় নয়
যুদ্ধ,
পৃথিবীর একমুঠো ধুলোর চেয়ে দামী নয়
মানুষের ছাই। মাতাল না হলে কি করে ভুলে থাকে
পৃথিবী নামক জীবন্ত গ্রহের মানুষ
পরস্পরের দিকে তাক করে আছে
নিজেরই তুম্ব্যবাণ।

সত্য গুহ

নাতি অতীতের স্মৃতি গুড়োকেও পিতা করে তোলে

এখন মধ্য রাত, বাড়ির ভেতরে
আমরা অনেকে আছি
মায়ের উত্তপ্ত বুকে লেপ্টে আছে চারা
তেমন ধানের ক্ষেতে উৎপন্ন অঙ্কুর
প্রিয়ার আজন্ম শোভা অন্ধকারে ভাসে
কোমল ধ্বনি ও স্মৃতি সুখকর…
ভয়ানক বজ্ররবও মিলেমিশে আছে মনে হয়
কেননা নিয়ত জাগা ঈশ্বরের কাছে
তিন মাথা যোগ করে শৃঙ্খলিত করজোড় বাপ
হাঁপিয়ে বলছেন শুনছি :
'যে-প্রমত্ত ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূরণে অযথা
গাণ্ডীব রচনা করলো পাণ্ডবের চিতা
বলেন ও হাতড়ান যেন তাঁর ডালপালা
এহ বাহ্য, এই মধ্যরাতে
প্রিয়তমা সুন্দরীতমার বাহুবন্ধনে নিবিড়
আমি যে আতপ্ত যুবা মধুরতা ছিঁড়ে জেগে বসি
ঠাণ্ডা বয় রক্তের নালীতে
ক্রমাগত মনে হতে থাকে
সমুন্নত ভূগোলের পারমাণবিক যুগে প্রবেশ, সে মহাপ্রস্থানের
পথে পা-বাড়ানো বই নয়
ভাবি ও দুলতে থাকে ভিত
শক্ত করে চোখ রাখি জীবনের অর্জিত ফসলে
(আহা ! আলপনার মতো
স্বপ্ন সুর পড়ে আছে নিষ্পাপ নিরপরাধ অকাতর ঘুমে)
আমি আচমকা আঁকড়ে ধরি কৃষি শুদ্ধ ক্ষেত
বাড়ি জাগে আর্ত চিৎকারে
…একান্ত জরুরী কথা সবাইকে জানাতে চায় স্বর

নক্ষত্র তো একমাত্র পৃথিবী
এখানেই জলাভূমি, আলো-হাওয়া-উর্বরতা—বাঁজে প্রাণ আছে
নারী ও পুরুষ চায় পরস্পর মাখামাখি হতে—গানের প্রবাহ হয়ে যেতে
ধ্বংস হয়ে যেতে ভীত হয়

নাতি অতীতের স্মৃতি বুড়োয় না, গুড়োকেও পিতা করে তোলে।।

উৎপলকুমার গুপ্ত

গোলাপ ঃ

একটি ফুলকে ফোটাবার জন্য আমার এই জেগে থাকা
ফুলের রঙ যাতে নষ্ট না হয়
কীট পতঙ্গের আক্রমণ যাতে ঠেকানো যায়
তার জন্য
ফুলের পাশে পাশেই থাকি সারাক্ষণ
যাতে
ফুলের স্বপ্ন গাঢ় হয়ে নামে

কিন্তু আশ্চর্য এই এত যে সতর্কতা
অনুক্ষণ এত যে পাহারা
সব পার হয়ে কখনো শিকড়ে কখনো বা পাতায়
দেয় যায় বিরুদ্ধ ঘোষণা
ফলে ফুলের স্বপ্ন ফুলের গরিমা
লুটিয়ে পড়ে আলোয়
আমি দেখতে পাই মেঘ ঘন হয় আকাশের নীলে

আমার চেষ্টার তবু শেষ নেই যেন ঝরে-পড়া ফুলকে
একটি একটি করে পাঁপড়ি কুড়িয়ে নিয়ে
ফের জোড়া দেয়া

যেন ভিতরে ভিতরে গভীর এক রঙে
ফুলটিকে রাঙানো
যার ফলে দিব্যি ফুটে ওঠে এক রঙিন গোলাপ
আমি তখন গোপনেই গোলাপটির নাম রাখি 'ভালোবাসা'

প্রদোষ দত্ত

আর যুদ্ধ নয়

পারমাণবিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা,
'ব্ল্যাকহোলে'র বিভীষিকা!

পারমাণবিক যুদ্ধে জলে গেল,
নিমেষে ছাই হল পুড়ে!
প্রাণী, গাছপালা কিছুই অবশিষ্ট থাকল না।
জ্বলে গেল মাটি, ধরিত্রী!
উষর পোড়ামাটির বুক দিয়ে
বিধ্বংসী তাপ বিকিরিত হচ্ছে—
বাতাসে বিষাক্ত তরঙ্গ উঠছে—
পুড়ে পুড়ে খাক্ হচ্ছে সবকিছু!
কতকাল সৃষ্টি আর হবে না,
কেউ তা জানে না,
কতকাল নির্জীব নিষ্প্রাণ।
পরীক্ষা-নিরীক্ষা থামাও,
আর বিস্ফোরণ-তত্ত্ব নয়!
কণ্ঠরোধকারী হিরোশিমা নাগাসাকির ভয়ংকর স্মৃতি
মানুষ ভোলেনি। ভুলতে পারে না।
বেঁচে থাকা সকলের সাধ। এই মাটি, এই জল,
এই আলো, এই বাতাস,
বিশ্বের সকলের অধিকার এই আবাস।

শান্তির নামাবলী গায়ে আর যুদ্ধ নয়,
আর ধ্বংসের বিজ্ঞান নয়,
বিজ্ঞান মানব-কল্যাণ।
এখন উপগুপ্ত কোথায়?
নিভৃতে কি গ্রহ-পরবাসে?
শান্তির পারাবত ছড়িয়ে পড়ুক সহস্রধারায়!
চিরকালের শীলমোহর আঁকা হোক
বিশ্বের আবাসে আবাসে।

শুভাশিস্ গোস্বামী

ফেলে দাও প্রহরণ

আগুন নিয়ে যে কি খেলা খেলছ তুমি!
চারিদিক হল আগুনে আগুনময়
জড়িয়ে নিয়েছ আগুনের আঙ্রাখা,
আগুন গিলছ উগরে দিচ্ছ আগুন।

আগুনেই ছিল সভ্যতার শিকড়,
আগুনই দিয়েছে মানুষের ডানা মেলে।
সেই আগুনেই জতুগৃহ জলে যায়,
পুড়ে খাক হয় হিরোশিমা নাগাসাকি।

তার চেয়ে এসো নতুন আগুন জ্বালি,
ছুঁড়ে ফেলে দাও সমস্ত প্রহরণ।
অগ্নিশুদ্ধ হতে হবে আজ তাই,
এসো মেতে উঠি চাঁচরের উৎসবে॥

অনন্ত দাশ

প্রতিবাদের কণ্ঠ

এখানে প্রতিটি নারীর ঠোঁটে ভালবাসা
এর সমুদ্র প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
আকাশ অপার রহস্যময়
অরণ্য গহীন ও জটিল—
এর বাতাস আমাকে স্তব্ধতা শেখায়
এর নদী থেকে আমি মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ শুনতে পাই
পাহাড় থেকে ধৈর্য
এখানে বেঁচে থাকার গভীর স্বাদ
আমি প্রতিদিন অনুভব করি রোমকূপে,
শিরায় শিরায়

অথচ যখন দেখি
এই সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য কিছু মানুষ মেতে উঠেছে :
চতুর্দিকে ধোঁয়া ও বাষ্প
সূর্য নিভে গেছে
আকাশে তারা দেখা যায় না
হাওয়ার মর্মর শব্দ নেই
গাছেদের পাতায় আর ঢেউ খেলছে না
নিস্তব্ধ নগর, নির্জন পথঘাট
মানুষ ও পশুর দেহ এক হয়ে গেছে—
সেই আদিম অন্ধকারের দিকে চেয়ে
আমি শিউরে উঠি
আমার প্রতিবাদের কণ্ঠ ছড়িয়ে দিই বহুদূরে
পৃথিবীর কানায় কানায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আভেনিদা এল সালভাদোর

(মার্কস-এর মৃত্যু-শতবর্ষে)

লকহীডে সব ছুটি বাতিল।
শিরার শিকড়-জড়ানো হাত
কাজ শুধু কাজ জিরো আওয়ার
মারণ খেলায় কী তৎপর—
তবুও শান্ত, শকাজিং
আভেনিদা এল সালভাদোর।

চাবি আছে। কোনো দরজা নেই।
রিপু তাড়নায় ক্ষিপ্ত হাত
ত্যাখো, সাইমন বলিভারের
গলা ও মুখের মাঝখানে
টানে সাবলীল ছুরির ছড় ;
কেপ কেনেডির বালি চোখের
আভেনিদা এল সালাভাদোর!

ভূগোলচিনে ছোট্ট তিল,
তবু তাকে নিয়ে ভারি নাকাল
ক্রুপস ইসপাত কারখানার
যত সব দুঁদে টেকনোক্রাট,
কার্নেগি হল-ও খোলে নখর—
আমেলিয়া নেমি আটেগা-র
আত্মদানের পুণ্যে লাল
আভেনিদা এল সালভাদোর।

টেলেক্স ছুটেছে ভয়া মাতাল,
ছুটিকাটা সব কোম্পানির,
কাক-পক্ষীর পায় না টের

কবি এডগার ভ্যালেঞ্জো আজ
মুর্দা কুঠিতে কেন নিথর,
সাংবাদিকের এক্সক্লুসিভ
এড়িয়ে তবুও দেশে-দেশে
তোলপাড় তোলে সেই খবর,
কবি ভ্যালেঞ্জোর মৃত্যু নেই—
আভেনিদা এল সালভাদোর।

ঁ মও বলেছো : মৃত্যু নেই,
.নকারাগুয়ায় ওঠে ইকো,
ভোরের চেয়েও জরুরি সেই
শ্লোগানে শ্লোগানে ভালোবাসায়
জ্বলে ওঠে আলো চম্পকের ;
টেলেক্স-এ তোলে পাগল ঝড়
আভেনিদা এল সালভাদোর।

মুকুল গুহ

আমাদের জীবনযাপন

আমার তো মনে হয়েছিল, যখন অন্ধকার শিকড়
নামিয়ে দিচ্ছিল শিরায়, উপশিরায়,
যখন প্রথম পাখিটাও ফিরে আসেনি কুলায়, যখন
হাতে ধরা পতাকাটা রক্তে লাল হয়ে অন্ধকার বাতাসে
থির থির করে কাঁপছিল,
তখন,
আমার তো মনে হয়েছিল, সূর্য ওই কালো পাহাড়ের আড়ালে
বুঝি চিরকালের জন্য ডুবে গেছে,
আর কোনদিন উঠবে না—

হাজার বাতি জ্বালিয়েও অন্ধকার ঠিক দূর করা যায় না,
আমি জানতাম,
সূর্য উঠলেই কেবল অন্ধকার দূর হয়, আমি জানতাম,
পতিত কিংবা সন্ন্যাসীর ওপর, উদ্যান কিংবা আস্তাকুঁড়ে
সূর্য একইরকমভাবে কিরণসম্পাত করে থাকে
আমরা এসবই জানতাম

কিন্তু,
যখন হতাশা ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছিল,
ঘাতকদের মতন নিশ্চিন্ত ও কুশলী শিক্ষায়,
তখন,
সূর্যের কথা আমাদের মনে থাকেনি, আমরা
ভুলে গিয়েছিলাম,

অথচ, সূর্য যে চিরকালের জন্য ডুবে যেতে পারে না
সেটা অন্য অনেকেই জানত,
আমরাও জানতাম নিশ্চয়ই, শুধু মনে পড়েনি—

অজিত বসু

গুমোট

গুমোট হাওয়া
যেন উল্টি-খাওয়া

ফের যেন ঘুণ
অনির্বচনীয় মুখচুণ।

ঘন ঘোর
মুছে যাওয়া শব্দ ও অক্ষর
ফাটিয়ে ফুটিয়ে তপ্ত লাভা
বিলীয়মান অভূতপূর্ব আভা

স্নায়ুযুদ্ধ
শ্মশানী নিস্তব্ধের মধ্যে চুপ,
গ্রাসিত নদীর গর্ভে মাটি ঝুপ ঝুপ ··

করোটির উদ্ভাবনী শক্তি
স্থাইচে গলিত পিত্তি
পিণ্ড,
নাভি কাঁপিয়ে হাসে অকালকুষ্মাণ্ড !

ডেঞ্জার !
ধ্বংসের এ্যারেঞ্জার মারে কাঠি—
বসনের আবরণ ছুঁড়ে ফেলে
অঙ্গগৌরবে দোলে বিষাক্ত ফণাটি ।

জিজ্ঞাসা,
উল্টে দিয়ে পাশা
বলে জিৎ ;
নড়ে ওঠে সমস্ত ভিত্ !

সম্বিৎ দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত
গোণা শুধু ডেথ্ টল কত !

শিশির সামন্ত

শান্তি শান্তি

বুদ্ধ মন্দির হ'তে জ্বলন্ত পোষাক নিয়ে
পলায়নপর এক মা ;
কে সেই মা ?   শান্তি, শান্তি !

রক্তাক্ত পূর্বমেঘ, ইন্দোচীন ।
হিরোসিমা, ননপেম, ভিয়েতনাম, মাইলাই ;

সেখানেই
সবুজ নারকেলবীথি, তালগাছ,
শান্তির চুলের মতো এলো চুলের শান্তি,
কে আজ টানলো সেই কেশের
মেখলা ?

মিলনমন্ত্রের মতো ছিলো জানাশোনা
চৈনিক কবির সাথে,
শ্যামতটে, দূরে কম্বোডিয়া ;
যেত যে মৈত্রীর এক ফেরী নৌকো,
সেই শতরূপা তুমি শান্তি, শান্তি !

কোন দেশ প্রবাসিনী তুমি শান্তি
ইতালী জননী ?
দেখা তো হয়নি শান্তি এ দশকে,
স্বদেশ ভারতবর্ষে তুমি আজ
কোথা শান্তি ?
আমি যে-দেশের লোক,
সাম্রাজ্যবাদকে ভালো চিনি !

জাগে যে বাস্তিলে এক নব কৃষ্ণ
জলন্ত শিশুকে নিয়ে ছুটে যায়
কৃষক রমণী শান্তি,
যে মুক্ত দুনিয়াস্বপ্নে হাতের শিকলে
চাড দিয়ে ভাঙে শান্তি,

মানচিত্রে জলে ওঠে, সেই আলোতেই
প্রতীকি জননী !

শান্তি রায়

প্রতিরোধ

আমি ঘৃণাগুলোকে তোমাদের দিকে
হার্তুনের মতো ছুঁড়ে দিচ্ছি
ক্ষোভের বারুদ মিশিয়ে ঘটাচ্ছি বিস্ফোরণ
তারপর ··· ঠিক তারপর তুলকালাম কাণ্ডকারখানায়
কাঁপাবো ভুবন
তামাম বিশ্ব জুড়ে তছনছ করবো মেকি মানচিত্র,
পুরনো ভূগোল
আমার অহংকার ও অঙ্গীকারের বৃত্তে ধরা পড়বে
সমগ্র বিবর্ণ দুনিয়া :

আমি ঘৃণাগুলোকে তোমাদের দিকে হার্তুনের মতো
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি
পারো তো প্রতিরোধ করো হে বেইমান বিশ্বাসঘাতক
সময়ের দাস,
হে দালাল ধূসর সভ্যতা ··· !

সুমিত চক্রবর্তী

আমরা জানতাম না

বাতাস কীভাবে মাতাল হয়ে আছড়ে পড়ে কচিঘাসের বিছানায়—আমরা জানতাম না। জানলাম লেনিনগ্রাদে, পিস্‌কারেভস্কি গোরস্থানে।

একচল্লিশ, বেয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ—সালগুলো পাথরের মাথায় চুপ করে দাঁড়িয়ে। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে নিচে রাখা কাস্তে-হাতুড়ি। হাতে গোণা কয়েকটি সংখ্যা—অথচ মানুষ ? কচি ঘাসের নরম চাদরে ঢেকে গেছে তাদের দেহ।

মাতাল বাতাসে ভেসে আসে রাত্রিদিন লেনিনগ্রাদ-জননীর কান্না। কান পাতলে শোনা যায় সেই কান্নার গান। চোখ বুঁজলে দেখা যায় দু-হাতে ক্ষুত্রার্ঘ্য বাড়িয়ে দাঁড়ানো সেই নারীমূর্তিকে।

লেনিনগ্রাদ—বিপ্লবের ধাত্রী লেনিনগ্রাদ অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে। অবরোধে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য কান্নার শেষ নেই।

কালো মেঘের সামিয়ানার নিচে আলিঙ্গনাবদ্ধ নব-দম্পতি। তাদের পেছনে বুলগেরিয়ার পার্তিজান। সকলেরই চোখ ভেজা।

কান্নার গান কীভাবে বজ্র হয়, ভেজা চোখে কীভাবে আগুন জ্বলে—আমরা জানতাম না। জানলাম পিস্কারে-ভস্কি গোরস্থানে, লেনিনগ্রাদে।

পরমাণু-অস্ত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা কত অতলস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে—আমরা জানতাম না। জানলাম লেনিনগ্রাদে, পিস্কারেভস্কি গোরস্থানে, গোটা সোভিয়েত-ভূমিতে।

সন্দীপ বিশ্বাস

কেনা মাথা

আমার খুব হাসি পাচ্ছে, কারণ
আমি এই মস্ত পৃথিবী থেকে বেছে বেছে সমস্ত
মাথাই কিনে ফেলেছি। এবং আমি আমার
সেই কেনা মাথাগুলোর জন্য শপথ করেছি,
আমি ওদেরকে সম্রাটের সুখ দেব;
বদলে ওরা শুধু আমাকে পৃথিবীটার রাজা করে দেবে।
ওরা খুশি হয়েছে আমার কথায়, বিশ্বাসও করেছে,
কারণ ওদেরকে আমি অবিশ্বাস্য কিছু সুখ দিয়েছি।

কিন্তু

ওরা জানেনা ওদের অন্তর থেকে আমি কবে কোন্ সময়ে
ছিনিয়ে নিয়েছি ভালোবাসা, বদলে ওদের হৃদপিণ্ডে
বসিয়ে দিয়েছি জমজমাট কালো, এতো কাণ্ডের পরেও
ওরা আকৃতিতে এখনও সেই অবিকল মানুষ,
তবে, স্বভাবে আমার পদলেহক।

আমার পৃথিবীর রাজা হওয়ার স্বপ্নের থেকেও
ওদের কাছে এখন আমাকে রাজা করে দেবার স্বপ্নটা
অনেক বেশি তীব্র।

ওরা আমার কেনা মাথা, ওদেরকে আমি কিছু অবিশ্বাস্য
সুখ দিয়েছি। বদলে অন্তর থেকে কেড়ে নিয়েছি ভালোবাসা
যাতে ওরা

আপাদমস্তক মানুষকে ভুলে যায়, কলকাকলি ভুলে যায়,
স্মৃতি বিস্মৃত হয়, এবং
হামেশাই স্বপ্ন দেখে আমাকে রাজা করার,
পৃথিবীর রাজা—

আমার খুব হাসি পাচ্ছে
আমি এইসব দারুণ মাথাগুলোকে কিনতে পেরেছি।

শিশির গুহ

মানুষ মারার কারিগর

এসো আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

যারা কঠিন মাটিতে ফোটায় ফুল, তুলে আনে ক্ষুধার অন্ন
পাথর ফাটিয়ে তোলে তৃষ্ণার জল
সেইসব কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র, কবি ও মানুষকে যারা
খুবলে খায় সারাক্ষণ, সেই সব শকুনির বিরুদ্ধে
এসো আজ ঘৃণা করি জমা।

পারমাণবিক মারণাস্ত্রে শান্তির মলম মেখে
মানুষ মারার কারিগরেরা শান্তির বেলুন ওড়াচ্ছে আকাশে
কবি, দেশপ্রেমিকের রক্তে গিলোটিন রাঙা করে
আণবিক অস্ত্রের উদ্যানে বসে ভাঁজছে শান্তির সুর।

দেয়ালের লেখন পড়তে চায়না ওরা
আর, হিটলার মুসোলিনীর ইতিহাসে ওদের এলার্জি
ওরা জানেনা পারমাণবিক অস্ত্রই শেষ কথা নয়
মানুষ, মানুষই বিশ্বে সর্ব্বশক্তিমান॥

কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে এগোচ্ছে মানুষ
আজ না হয় কাল সূর্যকে আনবে হাতের মুঠোয়
এই প্রতিজ্ঞায় স্থির হয়ে আছে।

দীপেন রায়

পরিণাম

ছিল দুর্ভিক্ষের অন্নহীন গার্হস্থ্য জীবন
একান্ত বালক বয়সে :
কলকাতার ফুটপাথ
মৃত মানুষের
বিকৃত শরীর
কোনো এক যুদ্ধের এই পরিণতি
আমাদের স্বাধীনতার
কিছু আগে
আমরা পেরিয়ে এসেছি।

যার বুকে মুখ রেখে একদিন
দুধে ও আদরে ছিলাম
পাশের বাড়ির সেই মেয়ে
রাস্তায় বেরিয়ে
সে আর ফেরেনি!

কাঁধে উঠিয়ে যে আমাকে আকাশ দেখাতো
একদিন দুর্ভিক্ষের টানে
সে ভেসে গেছে
আজো তাকে
দেখিনি কোথাও ··

বাচ্চায় দুধের সঙ্গে
মিশে আছে তেজস্ক্রিয় গুঁড়ো
গাছের পাতার সঙ্গে
পানীয় জলের সঙ্গে
মিশে আছে অন্নে ও
অন্ননালীতে
এ আর এক অসম-যুদ্ধের এই পরিণাম

শুভ বসু

ডানায় কি জানা

যখন সন্ধ্যার পাখি অবসরপিপাসু ডানায়
কুলায়মুখিন, পথ আর প্রান্তরের অপার কল্লোল
ফিকে হয়ে এলে, তবু পালকের নিবিড় আশ্রয়
ধরে রাখে কিছুটা উষ্ণতা, যাতে কাম্য বৃক্ষশাখাটির
পরম নীড়েও ফিরে সেইসব জনপদ নদী বনানীর
স্মৃতিটুকু নক্ষত্রপ্রহরে আনে মায়ামমতার স্বস্তি, স্বপ্ন, পরমতা

পাখিদের মত আর কোন প্রাণী জানে
নদনদীনগরীতে অভিব্যক্তিময় এই পৃথিবীর রহস্যময়তা ?

কে আর এতটা জানে
নারীদের স্বর কত আকাশনীলিমা ধরে রাখে ?

অন্ধকারের ভেতরে বাইরে বিনাশ দানোর আশ্রয়
মৃত্যুর দাঁত মেজে দেয়, সেই চূড়ান্ত হিংস্রতা
গোপনে নিজেকে উদ্যত রাখে, ত্রাসে কাঁপে দেশ জনপদ,
জানে গ্রাস এত প্রবল যে তার একটি অমোঘ চাপে
ভিয়েনা, মস্কো, কলকাতা, রোম, লণ্ডন, মিউনিক
মুহূর্তে গের্নিকা ;   হাহাকারের প্রচণ্ডতায় ঘূর্ণিঝড়ের ওপর

ঝিকমিক করে জ্বলতে থাকবে যমের তৃপ্ত খুশির প্রচণ্ডতা

যে পাখি অনেক দেশ ঘুরে বহু রহস্য জেনেছে, তাই
আসন্ন সন্ধ্যায় নীড়ে চলেছে স্বাধীন, সে কি

সে কথাও জানে ?

ব্রত চক্রবর্তী

যুদ্ধ

চৌকির নীচের অন্ধকারে ছিল একটা মরচে-ধরা তলোয়ার
তার ধাতুতে ছিল আমার পিতামহের আঙুলের স্মৃতি।

একদিন অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে এনে
মুঠোয় সেই মরচে-ধরা তলোয়ার ধরতেই
শিরার শীর্ণ নদীতে লাগল স্রোতের উচ্ছ্বাস
রক্তে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা
ফুসফুসে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের টান
শরীরের প্রতি লোমকূপে কথা বলে উঠল মন্ত্রের শপথ
কিন্তু কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ—দ্বিধাগ্রস্ত একথা ভাবতেই,
সব উদ্যমের ঘোড়া মুহূর্তেই পড়ে গেল অনভিজ্ঞ চিন্তার অসুখে।

অন্ধকার মরে গেল আকস্মিক বেজে-ওঠা দীক্ষাহীন অস্ত্রের গৌরব;

মনোজ নন্দী

আপাতত যুদ্ধে আছি

ভালো নেই, খুব ভালো নেই—এই কথা, একই কথা
বারবার বলে বলে খুব পুরনো হয়েছি। তাই
আজ শুধু বলি : বেঁচে আছি এই মাত্র—
আপাতত যুদ্ধে আছি।

যুদ্ধের সারথি নই আমি
নই আমি জলপাই রঙের সৈনিক,
শুধু শববাহকের ভূমিকা আমার...
বহন করেছি কিছু ম্লান বিপন্নতা,
সফলতাহীন নষ্ট নীল জলে ধুয়েছি বুকের ক্ষত।
তবু, আজও সভ্যতার পচাগলা লাশ দেখি ঐ
পড়ে আছে স্তব্ধতার নিষ্ঠুর জাজিমে—
আমার হাতের মুঠো বুঝি আজও ততদুর বিস্তৃতি পায়নি !

দণ্ডনীয় অপরাধে পড়ে আছে আজ
সাম্যবাদী সবুজ তূণীর শরবিদ্ধ রাজহাঁস, জলপরী,
সভ্যতার পণ্যবাহী পারমাণবিক যুদ্ধ জাহাজ...

ভালো নেই, খুব ভালো নেই। আপাতত যুদ্ধে আছি—
আছি প্রত্যাশায়—
যুদ্ধ শেষ হবে বুঝি কাল কিম্বা পরশু বা তারপর...

সুদর্শন চৌধুরী

ঘৃণার রঙ

নীলের পরে লাল দিয়েছি,
লালের পরে সবুজ ;
মধ্যিখানের আকাশটাতো
অন্ধকারই, অবুঝ—

সেই আকাশের কৃষ্ণচূড়া
কেমন হবে শুনি?
এক জলধির কান্না ঢেলে
পালিয়ে গেছে খুনী—

খুনীর জন্য বরণমালায়
কী রঙ দিলে ভালো?
একটা রঙই আছে কিন্তু
ঘৃণা-ভীষণ কালো।

অমিতাভ গুপ্ত

ওরা

আণবভস্ম মাড়িয়ে চলেছে ওরা যারা আজো রয়ে গেছে বেঁচে
চারিপাশে কালো আগুনের রেখা, ঘর ও খামার ছিন্নভিন্ন
আগুনকে ঘৃণা করেনি কখনো জেনেছে লোভের আগুন ঘৃণ্য
সেই ঘৃণা নিয়ে ওরা বেঁচে ওঠে: কত মহাযুগে কত সংকটে
বেঁচেছে মানুষ, ওরা বাঁচবে না? ভস্মে জীবন হয় না ক্লিন্ন
যে-নীলকণ্ঠ ভস্ম দীর্ণ ক'রে জেগে ওঠে, ওরা চেনে তার পথের চিহ্ন
যে-নীলকণ্ঠ যন্ত্রে খামারে খেতে আলপথে মানুষের ঘরে ঝড়ে বন্যায়
রোদের ঝাপটে
আজো টঙ্কার দিয়েছে পিণাকে, ওরা সাড়া দেয়, জাগে তার ডাকে
ওরা জেনে নেয় দ্রুতসংকেতে পৃথিবীকে কারা ঋণ ও রক্তে
ভ'রে দিতে চায় ··· ওদের দীর্ঘ হাত নেমে আসে যন্ত্রে খামারে
খেতে আলপথে

প্রণব সেন

মিছিলে কবি নেই

শকুনের উড়ন্ত ডানায় অন্ধকার
ক্রমশঃ ঘন হয়ে আসে পৃথিবীর বুকের ওপর,
আকাশের প্রান্ত জুড়ে জ্যোৎস্না নেই, পাখীদের ওড়াওড়ি নেই,
আতঙ্কিত আর্তনাদ ছড়ায় বোমারু বিমান।
রাজপথে গলিত শব, সভ্যতার বুক জুড়ে শ্মশানের ভস্মস্তূপ,
বাতাসের হাহাকারে করুণ দীর্ঘশ্বাস—
বিকলাঙ্গ অস্তিত্বের কান্না নিয়ে শুয়ে আছে অমৃতের পুত্রেরা।

সময়ের ক্যানভাসে পুরানো ছবি বদলে ভেসে ওঠে
জীবনের বিস্তীর্ণ মিছিল,
আগ্রাসী যুদ্ধ নয়, অন্য এক যুদ্ধের প্রস্তুতি।
মানুষের দৃপ্ত পদধ্বনিতে কলুষমুক্ত জীবনের অভীপ্সা,
সুন্দরের বন্দনাগান,
জঞ্জাল সরিয়ে এ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে যাবার অঙ্গীকার

এ মিছিলে কবি নেই।
খালাসী টোলায় মদালসা চোখের ভীড়ে তিনি মিশে আছেন,
স্নান ঘরে কোন নায়িকাকে নগ্ন দেখে
বিমূর্ত জিজ্ঞাসায় তিনি মগ্ন।
রঁলা, বারবুঁস, রবীন্দ্রনাথ ড্রইংরুমে কাঁচের ফ্রেমের আড়ালে শুয়ে
সেদিনের ইতিহাস ছাপানো অক্ষরের মধ্যে ঘুমিয়ে প্রাণহীন,
জীবনের মিছিলে না এসে যে কবি খ্যাতির বিলাসে দূরত্বে থাকে
তার উপযুক্ত মূল্য দেবে ভাবীকাল,
'কবি ছাড়া জয় বৃথা'-এ কথা হয়তো প্রাচীন প্রবাদ
একালের বিশ্বাসে তার কোন প্রতিধ্বনি নেই।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

যুদ্ধ

যুদ্ধের জন্ম হ'ল
অন্ধকারে—
শস্যহীন প্রান্তরে—
ক্ষুধিতের আগ্নেয় জঠরে :
মানুষের মাংস খসে যায়—
কঙ্কালে আবার জমে ওঠে মাটির ফস্‌ফেট
কোনদিন সবুজ-পত্রে লেখা হ'বে সন্ধির স্বাক্ষর।

তখন তারা—
খসে-পড়া মাংসের বংশধর
শান্তির শ্মশানে
আহ্বান করবে যুদ্ধের প্রেতদের :
শান্তির স্তবে মৃত্যুহীন যুদ্ধ।

তবু একদিন থাকবে না যুদ্ধ
বন্ধ্যা পৃথিবীর উত্তাপ
—নাইটারে গ্লিসারিনে গন্ধকে লোহায়—
নিভে যাবে সন্তানের স্বপ্নে :
তখন আর মানুষের পৃথিবী নয়
পৃথিবীর মানুষ সবাই।

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

ভোরের জন্য

এসো, আমরা একটা ভোরের জন্যে অপেক্ষা করি
এসো, আমরা একটা ফুল ফোটানোর ইচ্ছে নিয়ে
জেগে থাকি সমস্ত রাত—

চলো, আমরা ঘন জঙ্গলটাকে ভেঙে
উঠি গিয়ে ঐ পাহাড় চূড়োয়,
আমাদের ঘুমিয়ে থাকা ভেতরটাকে ঘা মারি।

আমাদের আসুক নতুন দিন।
বেঁচে থাকা সুন্দর হোক আরও
ভোর হোক, ফুল ফুটুক,
বয়ে যাক কিশোর বাতাস
এসো, আমরা ডুব দিই
পবিত্রতায়॥

লোকেন গুপ্ত

শেষ হোক্ মৃত্যু

ধর্মক্ষেত্রের মাহাত্ম্যকে মাথায় রাখ।
আজ বলার দিন এসেছে—
নারায়ণ! তুমি প্রভু বলেই
দশসহস্র নারায়ণী সেনাকে
কুরুক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবার তোমার
কোন অধিকার নেই।
ওদের প্রাণেও যে
লীলা করার সখ ছিল—
বৃন্দাবনে না হোক, অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ—
কাবুলে প্রতি বিপ্লবীরা
আবার হানা হানতে ব্যস্ত,
তবু তুমি বলবেই
হানাদারের অস্তিত্ব নেই কোথাও!

এতাবৎ এন্তার বলা হলেও
বোমা নিয়ে বদতামিজী বন্ধ হলো না।
রেগনী রিপুর উত্তেজনায়
আজও ভুগছে দক্ষিণ আফ্রিকা আর ইস্রায়েল।

তাই এই মুহূর্তেই বলতে হবে
এবং একা নয়, একসাথে—
যথেষ্ঠ হয়েছে, আর নয়!
বন্ধ করো বদতামিজী,
শুরু হোক্ যুদ্ধ
শেষ হোক্ মৃত্যু।

শিউলি রায়

শান্তির জন্য

শান্তির জন্যই এগিয়ে যাওয়া :
আমাদের ভবিষ্যত এবং স্বপ্নেও,
নাগাসাকি হিরোশিমা আর নয়
ইভ ও আদমের সন্তানেরা
পড়ে থাকে কবরে শ্মশানে
পচা গলা নষ্ট এই মানুষ।

শান্তির জন্যই এগিয়ে যাওয়া :
আমরা গলা মেলাই
উত্তর থেকে দক্ষিণে পূর্ব এবং পশ্চিমে।

রয়ে যায় পারমাণবিক যুদ্ধের
অভিশপ্ত রাত্রি—
পড়ে থাকে শুধু তেজস্ক্রিয় ধুলো।

শম্ভু বসু

হিরোসিমা নাগাসাকি আজও বিভীষিকা

ইতিহাসের পাতায় কালো রক্তে আঁকা
শ্বেত ভালুকের থাবায়
ক্ষত বিক্ষত চিত্র
হিরোসিমা নাগাসাকির
আজও বিভীষিকা
রক্তে জাগায় শিহরণ—
প্রতিটি রোমকূপ হয় বিদ্রোহী
লজ্জায়
ঘৃণায়।

বিজ্ঞান চায় না ধ্বংস পৃথিবীর শান্তি
বিজ্ঞান চায় না বিকলাঙ্গ ভ্রূণ মাতৃগর্ভে
বরং
বিজ্ঞান চায় মানবকল্যাণ…সুখ…শান্তি…
কিন্তু শ্বেতভালুকের থাবা আনে ঘন কালো ছায়া
বিজ্ঞানের স্বপ্নে ‥আশায়…আকাঙ্ক্ষায়…

ইতিহাসের পাতায় যেন লিখতে না হয় নতুন হিরোসিমা নাগাসাকির নাম
ধরিত্রীর বুকে যেন ফেলতে না পারে কালো ছায়া শ্বেত ভালুকের থাবা

এসো, সমগ্র পৃথিবী আজ এক হও, রুখে দাঁড়াও,
দাঁতে দাঁত দিয়ে রক্ষা করো…রক্ষা করো…
পৃথিবীর শান্তি
শান্তি তোমার…আমার…সকলের…
এসো, শ্বেত ভালুকের রক্তচক্ষু
বিষনখ
লোলুপ জিহ্বা

করে দিই অকেজো
সংঘবদ্ধ
প্রতিরোধে
প্রতিবাদে।

দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য

পরমাণু বোমা

হিরোশিমা নাগাসাকির চল্লিশহাজার কান্না
তেজস্ক্রিয় পরমাণু বিদারণের বিরুদ্ধে
দূষিত বাতাস শান্তির নীড় অসহায় মানুষ।

শুভ দায়িত্ব এড়িয়ে ধ্বংস চরম প্রতিবাদ
আজকের পঙ্গু-বিকলাঙ্গ চাকা ধুঁকছে
উদ্ধত বুর্জোয়া মনন আগামী সভ্যতার বিষ।

দুঃসহ যন্ত্রণা আনবিক হাইড্রোজেন হুমকি,
দূষিত জল সার্ভো-নিয়ন্ত্রিত কামান সজ্জা
সবুজ শিশির ধোয়া লাল ঠোঁট।

প্রতিবাদ মিছিল কবি-শিল্পীর অন্ধ চোখ
শতাব্দীর ঘট-উপুড় দুর্বার সাগর নীল
মুছবে না কমপিউটার, রেডার, উদ্ধত ক্ষেপণাস্ত্রে।

বিপ্লব মাজী

যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি মোমবাতি

পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে
কবিতার এ মোমবাতিটি
আমি জ্বেলে দিলাম

মানুষের ভালবাসা
এখনো খুঁজে ফিরছে
মানুষের ভালবাসা

মৃতের শহর কে চায় ?
মৃতের গাঁ-গঞ্জ কে চায় ?
আনবিক ধ্বংস কেউ কি চায় ?

উন্মাদ পশুদের জন্য
একটা চিড়িয়াখানা বানানো হোক ;
শিশুরা টিকিট কেটে দেখবে

হাজার হাজার যুদ্ধের
জন্ম-মৃত্যু ঘটে গেছে এ গ্রহে ;
এখনো কেন নক্ষত্রযুদ্ধের জয়দগব আশা ?

ধ্বংস, হতাহত, আগুনের ঝলক
ধোঁয়ার ভেতরে ভাঙাচোরা শহর—
কি করে জন্ম দেবে নতুন সভ্যতার ?

অলককুমার চৌধরী

দুটি পাতা ও নিউক্লিয়ার বিভাজন

দুটি সবুজ পাতা ঝলসে পুড়ে গিয়েছিল চারদশক আগে

দুপুর রাত্রে সাদা আলোয় ঝলসে উঠেছিল ঘর··
ছায়ামূর্তি অবয়ব পেল। কে ? কে ? উত্তর নেই—
মুখে ভুবন ভোলানো মিষ্টি হাসি। তীব্রটানে নিয়ে চললো
কোথায়।···

ভিনগ্রহ, শান্তি, থই থই, সমুদ্রের নির্দোষ উচ্ছ্বাস
শিলাময় পাড় ছোঁয় মত্ততায়। গোধুলির শান্ত আলো
ধীরে ধীরে নিভে আসে, দূরে ওঠে মায়াবী সরল চাঁদ—
আমাদের কোনো অস্ত্র নেই—অস্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে কবে
আমাদের যোগাযোগ মানসিক। তোমাদের ?—

আমাদের কার কত অস্ত্র আছে জানি না, শুধু অনুমানে কত পরিসংখ্যান
তবু অন্যের চেয়ে বেশি আমার চাই—তাহলেই আমি নিরাপদ।
চাই নিরাপত্তা, নিরাপত্তা শুধু—
পরমাণু ভেঙে ভেঙে নিরাপত্তা খুঁজে চলি তাই
তবু, এ-বড়ই ঠুনকো…
তোমাদের পৃথিবীর এক নম্বর নিয়ম কি ?—সরল জিজ্ঞাসা
আমাদের পৃথিবীর অনেক নিয়ম—কিলোমিটার কিলোমিটার
লম্বা রেখা দিয়ে অনেক ভাগে ভাগকরা
আমাদের পৃথিবী। মাটি, বেশভূষা, আচারবিচার,
বিবেচনা পৃথক। আর তাই চাই
আরো আরো নিউক্লিয়ার বিভাজন।

আবার ঝলসে ওঠে ঘর। তারপর নিভে যায় সব। নিজের বিছানায়
ফের। একি স্বপ্ন…
চেতনায় দগদগে ঘা। পরাজয়, পরাজয় শুধু। মৈত্রীবন্ধন
মিথ্যা হয়ে যায়। পারস্পরিক স্বার্থ শুধু। কি করি
কি করি। অশান্তি-দুকূল জড়িয়ে ধরে সমগ্র চেতনা। থাক গবেষণা
প্রয়োজন নেই সারাৎসার। বিভ্রান্ত ব্যাকুল।
উন্মুখ প্রতীক্ষায় শুধু রাত কাটে। যোগাযোগ চাই, চাই সাহায্য
কি করে বদলানো যায় পৃথিবীর অমোঘ নিয়তি—আত্মধ্বংস,
মন্ত্র চাই অমোঘ সেই মন্ত্র। এসো এসো তুমি এসো।
চারিদিকে সন্দেহের বিষবাষ্প ঘর ওলট পালট—
রক্ষীবাহিনীর কীর্তি।
তবু তুমি এসো। বলো কি করলে আবার ছাই ঘেঁটে
ফিরে পেতে পারি সেই-সবুজ দুটি পাতা।
…তুমি এলে অবশেষে ফের একদিন।
চলো অন্য কোথাও চলে যাই রাষ্ট্রীয়তা ছেড়ে
শিখতে চাই সেই মন্ত্র নির্জনে নিভৃতে।
চাকায় উধাও হই। কিন্তু ঘেরাটোপ বন্দী সংঘর্ষ
ওরা কিছু ধ্বংস হোল। হায় একটি বুলেট

বিঁধে গেল কপোতের কোমল
বুকে। আমার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
পরাভব পরাভব। কিছুই হোল না। ক্রমাগত
শব্দোত্তর তরঙ্গে জাগে শ্রুতি নিউক্লিয়ার
বিভাজনের—

আমার অতৃপ্ত আত্মা তবু ঘুরে ফেরে—
কোথায় সেই সবুজ দুটি পাতা!

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

কী এক বিষাদ

কী এক অলৌকিক বিষাদে ভরে
আবিশ্ব পৃথিবী!
এখনো বিদায়ী সূর্যে
আরক্ত সংরাগ,
আদিগন্ত মহানীলে ছড়ানো জ্যোতির আঁচল।
ফুল ফোটে, পাতা ঝরে,
কৈশোরের মন-কেমন-করা
স্বপ্নে কিশলয়
যৌবনের তটছুঁয়ে
আয়ত নয়ন তুলে দেখে
কলাবতী ঝরে গেছে।
শিমূলে-পলাশে বিস্মিত সকাল
কখন অভিভূত হয়ে গেছে রৌদ্রের সমাজে।
একে একে সরে যায়
শতাব্দীর তাম্রঘণ্টার মতো ধ্বনিময়তায়
কৃষ্ণরেণু অন্ধকার,

ভালোবাসার উচ্চারণ,
ঈর্ষাহীন অরণ্য,
চলে যায় স্বচ্ছতায়
আর এক ঝুঁকে-থাকা অনুচ্চারিত
শান্ত সন্ধ্যায় ॥

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধ নয় শান্তি

একটু পা চালিয়ে চলুন,
সমস্ত মানুষের পদতলে কেঁপে উঠছে
মৃত্তিকার বুক।
সমস্ত পা তাল লয় ঠিক রেখে
চলছে শান্তি মিছিলে,
সমস্ত শরীর থেকে রৌদ্রের গন্ধ বেরোচ্ছে.
একটু জোরে পা চালান।

ত্যাগে দুঃখে আর অপমানে ভরে থাকা
প্রতিটি মানুষ আজ পথে নেমেছে
যুদ্ধের ভয়ংকর বিভিষীকা এবং
আগামী প্রজন্মের শিশুর
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

শ্লোগানে কেঁপে উঠছে মানুষের গলা
কেঁপে উঠছে বাড়ির অলিন্দ
প্রেমিকার স্বপ্ন।
শুধু খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো
একটা নিটোল বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণা
মাথা চাড়া দিচ্ছে বার বার,

যুদ্ধের নির্মম ভয়াবহতা অস্পষ্ট কুয়াশার মতো
ঘিরে রাখছে আমাদের চারপাশ,
কুয়াশা ভেদ করে ছিলা ছেঁড়া তীরের মতো
অসংখ্য মানুষ ছুটে যাচ্ছে শান্তি মিছিলে।

প্রবীণ মহারাজেরা যতই মাথার মুকুট
নাচিয়ে মাতব্বরী করে
মোসায়েবের দল যত বেশী যুদ্ধের হুঙ্কার ছোঁড়ে,
ততই বুকের ভিতর থেকে
প্রাচীন যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে
ছুঁড়ে দেওয়া পূর্বসূরীদের শ্লোগানের সাথে
গলা মেলায় উত্তরসূরীরা —
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।

মিছিল বরাবর বিশাল নীল আকাশে
উড়ছে মুক্ত পাখীর ঝাঁক
মৃত্তিকা কাঁপিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুরন্ত শান্তি মিছিল।

উত্থানপদ বিজলী

অন্য মনু : পরমাণু

[বিশ্ব শান্তির সপক্ষে উৎসর্গী কৃত]

এক মনুর রাজত্বের পর চক্র-ক্রমে অন্য মনু আসে
মধ্যবর্তী কালে মন্বন্তর
বৃত্ত কখনো সরল রেখা নয়
তবে কেন মনে হয়
এই বুঝি শেষ মনু
এবং তারপর···অতল গহ্বর,
অথচ পর্বতে অরণ্য-শীর্ষে বিস্তৃত সাগরে
মুক্ত বায়ু বয়।

রাণী দত্ত

সাদা পায়রার ঝাঁক তোমরা কেউ কি দেখনি ?
ত্রিভুবনের ওপর দিয়ে অবিরাম উড়ে গেল
কনফুসিয়াস-বুদ্ধ-যীশু
হজরত-চৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের মিছিল,
হিরোসিমা নাগাসাকির চেয়েও
কী ঘৃণ্য উন্মাদনায়
সমস্ত বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য
কে ওই উদ্যত হয়
ক্রুর হাতে বাজাতে দামামা !

এক যোগে সবে তার কণ্ঠ চেপে ধরো...
অথবা ঘরের ভেতর থেকে আসুক জননী
কোটি কোটি সন্তানের স্নেহে
দুধ বলে হাতে তারে তুলে দিক বিষ...
জায়া তার...মুখ চেয়ে সহস্র সাধ্বির
সঙ্গোপনে সঙ্গমেতে বিষ-কন্যা হোক ।

মনুর রাজত্বের শেষে অন্য মনু :
পরমাণু
এ প্রজা-রঞ্জক সম্রাট
কখনো কারোর ক্রীড়নক নয় ।

রাণী দত্ত

মানুষের হৃদয়ের কথা

ভুলে যাও যুদ্ধের গান ।
ভুলে যাও পরমাণু বিস্ফোরণ ।

এখনও ভোলে নাই মানুষ
হিরোসিমা নাগাসাকির ইতিহাস

যুদ্ধ দিয়েছে মানব সভ্যতাকে সমগ্র জ্বালা
যুদ্ধ দিয়েছে শান্তির ঘরে চাবি।
বিংশ শতাব্দী করুক প্রমাণ
যুদ্ধ নয় শান্তিই
মানুষের হৃদয়ের গান।
কর্পূর হোক পরমাণুর উত্তাল তরঙ্গ
কর্পূর হোক শ্বেত শেয়ালের বায়না।
পৃথিবীর বুকে নেমে আসুক
শান্তির বৃষ্টি।

সুনন্দা মৈত্র

প্রাণের প্রতিমা

আনবিক পরিবর্ত পরিব্যাপ্ত ভ্রূণের কঙ্কাল
ছুঁয়ে যায় জাতিযোনি জ্ঞানের ইতিহাস।
ধ্বংস নেই প্রাণের বিন্যাস, বিষবাষ্পে ছেঁকে
নেবেই মহতী চেতনার নিগূঢ় শুদ্ধতায় কোটি কোটি
প্রজন্মের ফাঁদে, যা কিছু প্রাকৃত মৌল টিকে থাকে
নিজস্ব নিয়মে, প্রকরণ-যথার্থ কৌশলে।
বিজ্ঞানের জড় কুশলতা হেরে যায় শরীরের
বিশেষ অভিধানে, সেখানেই উত্তরণ শুধু।
শতাব্দীর ক্লেদ ঘৃণা আতঙ্কের পুঞ্জিভূত ফেনা
দুহাতে সরিয়ে তবে পায় প্রকৃতির যোগ্য নির্বাচন :
মানবিক ধ্যানে টলটলে স্রোতের কিনারে
আনম্র ফলভার বৃক্ষে পল্লবিত আয়ু,
মাটির আদিম শক্তি সপ্তাশ্বের খুরের দাপট
সুগভীর শিলাস্তর জনিতৃর জঠর অন্ধকারে
পুনর্বার জন্ম দেবে প্রাণের প্রতিমা।

রতন দাস

যুদ্ধের বিরুদ্ধে

কালো মেঘের ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে আছি আমরা
আর কতো বিষ মাখতে হবে গায়ে ?
সুবর্ণ সবুজের ওপর পারার প্রলেপ ক্রমেই
চোখ টেনে নিচ্ছে আমাদের
পোড়া গন্ধকের গন্ধে ভ'রে আছে শিশুর নিঃশ্বাস
আকাশে যন্ত্র-বাজের চক্কর কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে
আগুনের মতো চঞ্চল হচ্ছে বিপর্যস্ত জীবন
অথচ সবাই জানে, এ পৃথিবী শুধু প্রাণের,
পিশাচের নয়,
বুলেট, বেয়নেট বা বারুদেরও নয় !

তাহলে ছায়ামূর্তির মতো কারা দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে
রুদ্ধ করতে চাইছে জীবনের স্বাভাবিক স্রোত ?
আমাদের প্রিয় মাটি থেকে তোমার হিংসার থাবা সরাও
আমাদের সরল আকাশকে মুক্ত থাকতে দাও
শান্তির পায়রারা নির্বিঘ্নে উড়ুক…
হে যুদ্ধ, ফিরে যাও তুমি !

জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী

সর্বশেষ উত্তরাধিকারী ?

মানুষ নিজেই কি হতে চায় পরমাণুবোমার বিস্তারিত
ব্যাঙের ছাতার মত সাদা মেঘের আপাতদৃষ্টি নন্দন
এক ভয়ংকর তেজস্ক্রিয় ধ্বংসের পাগলামো ? মানুষ কী
হতে চায়—একমাত্র যে মানুষই পেয়েছে শংকরাচার্যের
মত মেধা, বুদ্ধদেবের মত অতল হৃদয় ? সে মানুষ

কি চায় শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে নিজেই
ধ্বংসের ভয়াবহ প্রতীক হয়ে যেতে ? মানুষ কি চায় সুসমৃদ্ধ
সভ্যতার সর্বশেষ উত্তরাধিকারী হবে মানুষের বদলে
অনাদি অমৃত পোকামাকড় আর দেবতার মত অমর ও বরণীয় আরশোলা ?

সাধন পাল

প্রাণের উত্তাপ

এই অবেলায় আতংকের
হিমেল প্রবাহ নামে রোমকূপে
ভবিষ্যত্‌ এখন ঝাপসা ম্লান
কোনশব্দ নেই চিত্রকল্প নেই ;
কিছু কিছু মানুষেরা এখন নির্মম
গ্রানিট কঠিন চোয়াল উঁচিয়ে
এক বিরল ধ্বংসের
চিত্ররূপ রূপায়নে ।
কিন্তু এ পৃথিবী কতবার
ধ্বংসের নষ্টভ্রূণ
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আস্তাকুঁড়ে
প্রাণের উত্তাপে ঝলোমলো
বুকের ভিতরে
ইতিহাস জানে সেই
প্রাণের উত্তাল কথা
আজ সেই সন্ধিক্ষণে
পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়ালপ্রেক্ষিতে
ইতিহাস আবার উত্তর দাও
প্রাণের নিরিখে

শতরূপা সান্যাল

শিশুরা খেলছে

শিশুরা খেলছে বরফের গোলা নিয়ে
কখনো কুটীর কখনো বা নৌকাও
ভাঙছে গড়ছে দশ আঙুলের চাপে
সূর্য কিরীট ঝলকায় বেলা বাড়ে

বরফ গলছে দরিয়ার দিকে ক্রমে
ধেয়ে যায় ধারা পাথর ফাটানো টানে
শিলা ক্ষয়ে ক্ষয়ে জীবন আকর মাটি
অশথের বীজ মাথা ছোঁয় মহাকাশে

শিশুরা খেলছে প্রতিদিন প্রতি রাত
ফুরোয় না ক্ষণ ফুরোয় না এখানেই
বসন্ত ঘোরে বরষাও চলে গেলে—
নীল ফুলে ভরে ন্যাড়া জারুলের ডাল

দুনিয়া এগোয় যুগান্তরের পথে
গোলা ঘর ভরে সোনা চাঁদি আর টাকা
তীর ধনু থেকে হরেক কিসিম বোমা
শিশুরা তখনও বরফের ঘর গড়ে।

স্বপন নন্দী

যুদ্ধ বিরোধী

বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি অপুর আকাশ
নিশ্চিন্দিপুরের মাঠ
পথের পাঁচালী।

চোখ রাঙালেই টলবো না
তীর ছুঁড়লেই ভাঙবো না
রক্তপাতে চেনাবো পল্লবের উদ্ভাসন
শৃঙ্খলে বাজাবো গান।

আসছি ব'লে শিস্ দিয়ে চলে গেছে মঞ্জুভাষ দোয়েল
কেটে নিয়েছো ডানা
তাঁর শেষকণ্ঠ আমাদের বলে গেছে—
বোমারুর দূষিত নিনাদ
শঙ্খধ্বনিতে শোধন করে নিও।

সাগরপারের পদধ্বনিকে স্তব্ধ করে দেবে
আমাদের সম্মিলিত করতালি
বলবো—এসো হে মানুষ
বুকের রণক্ষেত্রে এসো ভাঙো
ভাঙো ক্ষুব্ধ বাতায়ন
এসো মৈত্রী এসো।

অজয় নাগ

যুদ্ধ নিজেরই সঙ্গে

একা নেই ছায়া আড়ালের কাতরতা
ঝোড়ো পিয়ানোর সুর— জ্যোৎস্নার আশ্রয়ে
পর্ণকুটিরে দূরের নক্ষত্রের রাত
ভাসমান রৌদ্রঘোষ সমর্পিত অক্ষরে
গলে যায় পাহাড়ী ঝর্ণায় শ্বেত বিভীষিকা
নারীর আমূল টানে বেদনার হাত প্রসারিত

আছে প্রেম অসীম
একা নয় পাশাপাশি থাকে মৃত্যু—জন্মের ভাই
গ্রহের আকাশ কড়া নাড়ে ঘুমন্ত দরোজায়…
যুদ্ধ তবে কার সঙ্গে
—দিনের সঙ্গে দিনের রাতের সঙ্গে রাতের
নিজের সঙ্গে নিজের অহরহ

ওই দ্যাখো
মাটির পায়ের পাতায় জলের প্রণতি ফিরে ফিরে আসে
শিশুর কলতানে খুনীর গুপ্তি খসে

শিবাজী গুপ্ত

শিশুরা খেলছে দেখ

আমি দেখছি
আমাকে ঘিরে রয়েছে শিশুদের গোলাপী মুখ
তাদের খেলার মধ্যে ছড়ানো ছিটোনো
কিছু পুতুল রঙীন ছবির বই কিছু ফুল
হেলায় ফেলায় যারা বাঁচে
ভাঙা খেলনার প্রতি তাদের মমতা
আমি শিখছিলুম অল্পে অল্পে

শিশুদের দিকেই উড়ে আসছে
শিশুদের গান
কবিদের যত ছড়া আর লেখাশিল্প
শিশুদের নিয়ে বড়দের ভাবনাগুলি
লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে হেঁটে আসছে
ওরাও খেলবে নাকি

বহুদিনের বিখ্যাত নীল আকাশ
মাথার ওপর কবে থেকে জেগে
পাখিরা পালালো কোথায়
সাতরঙা পাখিরা এখন কোথায়

আকুটে ছেলেরা দাঁত বের করে হাসছে
ভাঙতে এসেছে কি শিশুদের খেলা
ধোঁয়ার মধ্যেই ওদের আসা আর যাওয়া
খেলা ভাঙাই বুঝি এক খেলা

শিশুরাই দৌড়ে এল হাজারে হাজারে
হাজার ছুঁয়েছে লক্ষের ঘর
লক্ষ থেকে কোটি কোটি থেকে আরো
অসংখ্য কোটিতে

দুষ্টু ছেলেগুলো বলল
আমরা এখানে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলব
শিশুরা শুধু বলল না না না
সেই না বড় হতে হতে মুছে
দিতে লাগল
সর্বনাশী ছেলেদের মুখ

শিশুরা খেলছে দেখ

সুস্নাত দাশ

সূর্য উঠবে, সূর্য ডুবে যাবে

সূর্য উঠবে, সূর্য ডুবে যাবে
গাইবে না পাখী আর গান
ভ্রমরের চুম্বনে জাগবে না ফুল
সব রঙ মুছে যাবে
ঝরে যাবে রূপ
আদিগন্ত অহল্যাভূমির

সূর্য উঠবে, সূর্য ডুবে যাবে
বীজতলা বুনবে না কেউ
ঢেকির পাড় ভাঙবে না কোনো
আলতা রাঙা পা
সুবাস মেখে বগবগিয়ে
উঠানে ফুটবে না সত্ত কোটা ধান
নয়ানজুলি ধূসর ইস্পাত

সূর্য উঠবে, সূর্য ডুবে যাবে
কচি কচি মুঠি দিয়ে কেউ
জড়াবে না মায়ের আঁচল
স্নেহময়ী কণ্ঠ কোনো বলবে না
: খোকা আর চাড্ডি ভাত নে
নদীকে সাক্ষী রেখে
কারুর অধর ছোঁবে না প্রিয়তর মুখ
শোনাবে না : ভালোবাসি শুধু

সূর্য উঠবে, সূর্য ডুবে যাবে
উড়বে না কোথাও এতটুকু ধোঁয়া
বিশ্বকর্মার রথের ঘর্ঘর থেমে যাবে
চরাচর নিস্তব্ধ—নিঃঝুম
আকাশ ছিঁড়ে ওঠা বলিষ্ঠ বাহু
প্রমিথিয়ূস হতে চাইবে না আর
কারখানার গেটে গেটে জ্বল জ্বল জ্বলবে না
জ্বলন্ত পোষ্টার

সূর্য উঠবে, সূর্য ডুবে যাবে
বাতাসে ভাসবে না ভাটিয়ালি সুর
রবি ঠাকুর কিংবা রোবসনের গানে
লাল মাটির ধুলো উড়বে না আর
শহরের কাফে, ভার্সিটি ক্যাম্পাসে
ঝলসে উঠবে না রিলকে, হাইনে,
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া ব্রীজ শুনশান্
ময়দান কাঁপবে না শব্দে :
গো-ও-ও-ও-ল

সূর্য উঠবে, সূর্য ডু.ব যাবে
সূর্য উঠবে, সূর্য ডুবে যাবে
সূর্য উঠবে, সূর্য ডুবে যাবে

গৌতম ভট্টাচার্য

আজ রাত্রির ঘুম নেই

আজ রাত্রির ঘুম নেই
বেগে ছুটে আসে নির্ঝর—
পথ আজ শুধু পায়ের
দিগন্তে শোন হ্রেষারব।

পটভূমি ছিল বন্ধুর
স্বদেশ স্বজন প্রতিকূল
বারে বারে হাওয়া নেমে যায়
তবু ধরো দাঁড়, আরো টান,

ছোট হয়ে আসে সসাগর
পিছে সরে যায় লোনাজল
শোন রক্তের কলরোল
দেখো সারি সারি চেনামুখ।

আকাশ ঢেকেছে খাঙা মেঘ
বাতাস হয়েছে মন্থর
আশ্লেষে কাঁপে দশদিক
আজ রাত্রির ঘুম নেই।

প্রমোদরঞ্জন

আমাদেরই রক্ত ঘাম অশ্রু চুঁইয়ে চুঁইয়ে

প্রগতির রঙ সবুজ না নীলাভ
নিনাদিত মঞ্চে কার মুখ
নাক্ষত্রিক চেতনায় কিসের উজ্জ্বলতা হনন
মানুষকে কারা ভোলাচ্ছে ভালোবাসা

নিরন্ন ইথিওপিয়া কবন্ধ প্যালেস্টাইন
শোনা যাচ্ছে বেঞ্জামিনের শেষ আর্তনাদ
মন্ডেলিন এখনও বন্দী
মধ্যরাতে ঝাঁকে ঝাঁকে তরোয়াল খোলার শব্দ

অনবরত উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রপাঠে ব্যস্ত প্রভুরা
রক্তঘাম অশ্রুর ইতিহাস ভোলাতে চান
ওদের পতাকায় দম্ভের চাকা আঁকা
ওরা এখন মগ্ন পাশুপাতে

প্রতিদিন ভেসে আসে খাণ্ডব দাহন
ভ্রাতৃহত্যার নগ্নখবর পৃথিবীকে মনে হয়
একটা জলন্ত ভিসুবিয়াস বুঝি তার উপর
চড়ে বসে আছে কয়েকটা মুখোশ পরিহিত দানব

আবার হিরোসিমা আবার নাগাসাকি
হাজার বছর পেরিয়ে আসা মানুষের বাসাবাড়ি
পৃথিবীর এই হবে আগামী উৎসব
সূর্যের গলিত রোদও কি একপ্রকার ভাইরাস

বন্ধ দুয়ার ভাঙো মানুষ তুমি জাগো
বলো আমাদের হাজার বছরের ওমে গড়া
এই মানবতা এই পৃথিবী কিছুতেই
চূর্ণ করা চলবে না থামাও তোমাদের
পারমাণবিক আহ্লাদ

মনে রেখো আমাদেরই রক্ত ঘাম অশ্রু
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস

কেদার নাথ পাল

রেকিয়াভিকে পায়রা শিকার

এত ঢাক ঢোল পিটিয়েও
সাত মণ তেল পুড়িয়ে শেষে
নাচল না রাধা
রেকিয়াভিকের হিমঘরে।

যেন.
ঠিক কুরুক্ষেত্র আগে
শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধন
দু জনে মটকে খেল
পায়রার ঠ্যাং।

অজিত বাইরী

তৃতীয় বিশ্বের মানুষ

ওরা আমাদের ভয় দেখায়,
আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক
আমাদের মাথার উপর চাপিয়ে দেয় টন টন বোমা।

দারিদ্র সীমারেখার নিচে
আমরা যারা দাঁড়িয়ে আছি,
ওরা উস্‌কে দেয় আমাদের ঘরের আগুন
স্ফুলিঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা।

ওরা আমাদের লেলিয়ে দেয়,
আমরা হাম্‌লে পড়ি সীমান্তে—
এই উপমহাদেশের ছোট ছোট দেশ।
আর চড়া সুদে ঋণ বরাদ্দে
ওরাই আমাদের দিয়ে ক্রয় করিয়ে নেয় ওদের অস্ত্র।

ওদের চোখে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক।
বেদখলীকৃত আমাদের আকাশ সমুদ্রে
ওদেরই সমর ঘাঁটি।
আমাদের বুকের উপর সাজিয়ে রেখেছে নৌবহর
আমাদের মাথার উপর বায়ুযান।

মানবিক অধিকার ছাড়া আর কি চাই আমরা
তৃতীয় বিশ্বের মানুষ ?

তবু হোয়াইট হাউসের ব্যালকনিতে
গন্ধহীন ফুলের মতো ফুটে ওঠে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন।

অরবিন্দ পাল

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই

সুন্দর এই পৃথিবীকে
সুন্দর করেই রাখো
কলুষিত হতে দিও না
আগামী প্রজন্মের মানুষেরা

বন জঙ্গল সাফ করে
পাহাড় কেটে একদিন
মানুষই সে সভ্যতা গড়েছিল
তাকে ধ্বংস করো না

অনেক মূল্য দিতে হয়েছে
অতীতকে কালের গহ্বরে
যদি পারো আরো সুন্দর করো
তবু ধ্বংস করো না

পাহাড় নদী আর সুনীল আকাশ
চেয়ে দেখো পূর্ণিমার চাঁদ

রাত্রির অন্ধকারে
টুকরো মেঘের যাওয়া-আসা
বসন্তের বাতাস ছুঁয়ে যায়
নিঃশব্দে যখন
স্মৃতি এসে দাঁড়ায়
জানলার পাশে

বলে যায় কানে কানে
"পারমাণবিক যুদ্ধ নয় শান্তি চাই"
এ কথাটা বলে দিও ওদের
যদি থাকতে চাও দুধে ভাতে ॥

দিলীপ দেব

"কবিতা নয়"

চাঁদে বসে কোনও এক বুড়ী
চরকায় সুতো কাটতেন,
সকালে গল্পটা বলেছিলেন
দাদু ঠাকুমা, অন্য কেউ নয়।

সময় গড়িয়ে দুপুর হলো,
কল্পনার ভেরা ভেঙে
শীতের রাত্রিতে চাঁদের বুড়িটা
মারা যেতেই,
শকুনেরা উড়ে গিয়ে জুড়ে বসলো
আর চরকা হলো পাথর।

সময়টাই আবার আবেলি হবে,
যদিও জানি,—
পাথর ডিঙিয়েই লাঙল, আর
শকুনের স্থান ক্যালেণ্ডারে।

কেননা, বৌদ্ধবীজ ভেঙে ভেঙে
সূর্য ছড়িয়ে যাচ্ছে চৌদিশে।
এবারের গল্পটা অবশ্য
আমার নিজেরই, দাদু ঠাকুমার নয়।

অনিতা চট্টোপাধ্যায়

আবার কি বিপন্ন হবে

আবার কি বিপন্ন হবে
খাবার টেবিল, প্রেমিকার হৃদয়, সন্তানের স্বাচ্ছন্দ
আবার কি বিষাক্ত হবে ঘাস মাটি আকাশ শিশুর মুখ
চুঁইয়ে নামবে নাকি ফের
উন্মাদের উল্লাসে
মহামারণের বিষ অফুরন্ত নীলাকাশ থেকে
নৃতত্ত্বের প্রেত হয়ে হিরোসিমা নাগাসাকি জেগে ওঠে অখণ্ড বাতাসে
টন টন বিষ বায়ুর চাপে
পিষ্ট হয়ে পড়ে বুঝি সবুজ পৃথিবী
ভীরু এলোমেলো চোখে তাকায় সে ধোঁয়া কুয়াশায়
কোথায় শ্বেত কপোত
কখন সে উড়বে আকাশে
নেমে এসে ঘাসে
ডেকে নিয়ে যাবে পুনর্বার
বিশ্বাসের—আনন্দের—সৌন্দর্যের বুকে

সাপের হিস্ হিস্ শব্দ বিষাক্ত নিঃশ্বাস
নীল হয়ে যায় বুঝি
প্রাণময় গ্রহ
মনে হয় আতঙ্ক-শঙ্কায়
রক্তে প্রবাহিত হয় ক্রুর হিমবাহ

আবার তবে কি যুদ্ধ
ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে নাগাসাকি শহরের শহীদ বেদীও
না সে হবার নয়
মৃত্যুর প্রতিপক্ষ মানুষ যে জন্মাচ্ছে প্রত্যহ ॥

শুভ মুখোপাধ্যায়

শান্তির কল্যাণ ভালোবাসি

মিছিলের প্রথম পতাকা
কেন এত বুকে দোল দেয়,
বানভাসি জলে কেন
চলে যায় সুখের সময়—
জীবনের অতিশয় দূরে—
পাখি নামে, খয়েরী জঙ্গল মাথা পাখি
তুমি নাকি বাল্যমনা নদীটির কাছে দেখেছিলে
সেই সত্য প্রাণপণ—ভালোবাসা, ভালোবাসাবাসি

বিপর্যস্ত হলে তবু মুখে থাকে বোধহয় হাসি,
পরমাণু যুদ্ধ নয়, শান্তির কল্যাণ ভালোবাসি।

সত্যেন বিশ্বাস

কলির পরশুরাম

পরশুরাম নাকি একুশবার
এ পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিল।
সত্যি কি মিথ্যে তা জানিনে। চোখে দেখিনি।
কেন করেছিল পরশুরাম এ সব কাজ?
ইতিহাস পাঠ করে আমরা জেনেছি—
"ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা" আদায় করতে।

এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কী যন্ত্রণার
যার থেকে নিদারুণ দুঃখ আর নেই।
যা আছে শুধু তার জন্য ভয়। কলির
পরশুরামের জন্য—দারুণ আতঙ্কে ভরা
সামনের ভবিষ্যত। আগামী কালের
চোখে—মৃত্যুর শাসানি। বেঁচে থাকা
বড় যন্ত্রণার—পরশুরাম আজও
সে-রকমই প্রস্তুত—রাগী। তাঁর প্রতিষ্ঠা চাই।

শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হিরোসিমা নাগাসাকিতে।
একুশবারের একবার মাত্র। আরো বিষ জমা আছে
বিশ বারের জন্য। পরমাণু মলিকিউল—সাজিয়ে চলেছে
মৃত্যু-ভাণ্ডার। কবর কাউকে খুঁড়তে হবে না—শবদেহ
কেউ বইবে না।। কাঁদবার কেউ থাকবে না—অথচ
লোভী মানুষগুলো—এসব আন্দাজ করেও—বাঁচতে
চায়। বোধহয়—মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া যায়—
সেই স্বর্গ সুখ ভোগের আশায়—মৃত্যুর যন্ত্রণা
ভোগ করে বাঁচতে চায়।

এক বিজ্ঞানী, এক নদীকে প্রশ্ন
করেছিল—নদী তুমি কোথা হইতে
আসিতেছ?—নদী উত্তর দিয়েছিল—
মহাদেবের জটা হইতে। মানুষকে যদি
প্রশ্ন করো—তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?
মানুষ বলিবে—মৃত্যুর জটা হইতে। কেমন
সে জটা?—বিদেহী আত্মা উত্তর দিবে—
কালো এক ঝাঁক মেঘের মত—যার
রূপ দেখা গিয়েছিল—হিরোসিমায়,
নাগাসাকিতে।

কলির পরশুরামদের—একজনের সঙ্গে
হঠাৎই দেখা হয়েছিল—সেই পরমাণু-মৃত্যু
শহীদদের একজনের—"স্বপ্নে"। প্রেত-হাত
তুলে সে বলেছিল—কি কষ্ট! কি গাঢ় সেই
অন্ধকার! সে আবেদন রেখেছিল—পৃথিবীতে
মানুষ জন্মায়—মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে।
ওদের বাঁচতে না দাও—অন্ততঃ স্বাভাবিক ভাবে
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। অপঘাত মৃত্যু কষ্টের।

"কলির পরশুরামরা"—ভুলে যেও না—? সত্য,
দ্বাপর ও ত্রেতা যুগের পরশুরামরাও—
পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে—নিজেরা
বাঁচেনি—। তারাও ফিরে গেছে "মৃত্যুর জটায়"
সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে—তোমরাও
একদিন—ফসিল হবে। মৃত্যু কাউকে
রেহাই দেয় না—এমন কি 'পরশুরামকেও'!
এমন বোমা তোমরা কোনদিন বানাতে
পারবে না—যা মৃত্যুকে মারতে পারে।

নীরেন্দু হাজরা
উড়িয়ে দিয়েছি আত্মা

বাতাসে আগুন ছিলো প্রাকৃতিক। মাথার উপর
উড়ছিলো প্রজাপতি। সৃষ্টির নিঃসীম মালকোষ
বেজে যায় ঘড়িঘরে। পায়ে পায়ে মিছিলে মিছিলে
কমলা রঙের বৃষ্টি ঝরছিলো চোখের তারায়।

এই আমি কিংবা তুমি—আমরা জীবন অভিমুখী
এই পথ শতভিষা, অনিকেত আলোর ময়ূর
উড়িয়ে দিয়েছি আমি—এই আত্মা : শ্বেত পারাবত—
ভাখো তুমি উর্ধমুখী, অযুজয় নয়—, শুধু সৃষ্টি।

পরিমল চক্রবর্তী

বাগানের ফুলগুলি ঝ'রে গেলো

বাগানের ফুলগুলি ঝ'রে গেলো। নিষ্পাপ, অম্লান
ফুলগুলি, একদিন যারা শুভ্র স্তবকে-স্তবকে
ফুটেছিলো আলো ক'রে জীবনের সুন্দর উদ্যান।

অন্ধকারে চোখ মেলে যে-ফুলেরা আকুল তৃষ্ণায়
'আলো দাও, আলো দাও' ব'লে তীব্র কেঁদে উঠেছিলো,
ঝ'রে গেলো সে-ফুলেরা, কোনো আলো পেলো না তো হায়।

চতুর্দিকে এতো কান্না, জীবনের এতো অপচয়।
কার জন্য ঘর বাঁধি, কার জন্য ঘর বাঁধো তুমি?
মরণের অন্ধকারে ছাখো আজ জন্মের বিদায়।

এ-কথা যখনই ভাবি, সারা দেহ, সারা মন কাঁপে
তীব্র এক যন্ত্রণায়; বলো বন্ধু, তুমি ব'লে দাও
বাগানের ফুলগুলি ঝ'রে গেলো কার অভিশাপে?

তারক ভড়

নক্ষত্র যুদ্ধের বিপক্ষে

'তোমরা কেমন আছো?'
—এ রকম সম্ভাষণে আজকের মানুষ
কি-ই বা বলতে পারে মুখের ভাষায়,
সমূহ সন্ত্রাসে শুধু মনের গভীর থেকে
চোখের তারায়
ফুটে ওঠে বিধ্বস্ত চেতনা।
এ সবের স্রষ্টিকর্তা মানুষ নামের জীব
মৌখিক বিভবে যার শান্তি আর সহাবস্থান
অনেক জটিল নীতি জ্ঞান বহুতর
সামগান বৈদিক ব্যঞ্জনা।

আজকেরও সহবাসে ফুটে ওঠে ছবি
অথচ মধুর নয়
করুণ কারুণ্যে ভরা বিভীষিকাময়
কালের করালগ্রাস বুঝিবা এগিয়ে আসে
শংকরের রুদ্র মূর্তি নিয়ে।

আমরা উন্নত জীব পৃথিবীর সব দেশে
বিজ্ঞাপনি এই ভিড়ে মানুষ-ই লজ্জিত এখন ;—
কেন না এ জীব মানুষ মারে,
পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টিকে ধ্বংসের মুখোমুখি
এনে ফেলে
বুদ্ধির দৌড়ে অস্ত্রে এবং সংকল্পে তার
স্থির নয় ভাসা ভাসা ছবি।

উত্তর বসু

সংলাপে নিজের সাথে

মানুষ খুনের জন্যে মানুষের হাত কত দীর্ঘ হতে পারে
মানুষ তা নিজেও জানে না ; সর্বজয়ী প্রভুত্বের স্বাদ
চেপেছে বৃদ্ধের মত সিন্ধবাদ সভ্যতার দুঃসাহসী ঘাড়ে,
তেজস্ক্রিয় ধুলিকণা ঢেকে ফেলছে, নক্ষত্র যুদ্ধের সংবাদ
সভ্যতার শিয়রে বসে, ওয়েটার, রাজপথে উড়ে যাচ্ছে গাড়ি
ওড়ার নেশায় ওড়া, একে কি ভ্রমণ বলো, রক্তে বসে আছে কোন
প্রাগৈতিহাসিক বৃত্তি ধ্বংসের খেয়ালে মশগুল মৃত্যুর কারবারী,
মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের মুখ, মানবতার স্বপ্ন কার হাতে গচ্ছিত এখন ?

যে শক্তি নিজেকে রাখে মৃত্যুর কায়েমী সিংহাসনে তুমি তার কাছে
জীবনের রাজস্ব দেবে কোন অধিকারে, তুমি শুধু তোমার নিজের
ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি কখনো ছিলে না, আজো নয়, ভবিষ্যৎ আছে
প্রতিশ্রুত আমাদের সৃজন শর্তে, সে কি শুধু মৃত্যুর দম্ভের
শাসনে লাঞ্ছিত হবে, সন্ধ্যার বাতাসে দোলে গুল্মোরের ডাল
শেষ বিকেলের রোদ ভালবাসা রেখে যাচ্ছে মানুষের চোখে
প্রভাতে ফিরবে বলে, সামাজিক রাত্রি শুধু বিশ্রামের কাল,
পারমাণবিক যুদ্ধ নয়, পারমাণবিক মুক্তি চাই এ ভূলোকে।

জীবনের প্রতিরোধে মানুষ জানে না তার হাতের দীর্ঘতা
কতদূর যেতে পারে, নক্ষত্র ছুঁয়েছে স্পর্ধা, লড়ে যেতে হবে
হয়তো বা দীর্ঘকাল ; বিশ্বাসে মিলায় জয় ও মৃত্যুহীনতা
এসো তবে লড়ে যাই পিছুটান ছিঁড়ে ফেলে, প্রাণের উৎসবে।

কমলেশ সেন

যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি কবিতা লেখার জন্য

যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি কবিতা লেখার জন্যে
দেমাকী রক্ত মাংস অস্থি পাঁজর নিয়ে
এক কবি শহীদ মিনারের
সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠে বসে।

শহীদ মিনারের মাথার ওপর
তখন উড়ছে
অসংখ্য সাদা কালো খয়েরি
ছোপ-ছোপ
গিরিবাজ পায়রা।

নিচে শুকিয়ে-যাওয়া মটরদানার মতো
অজস্র মানুষের
ছোট বড় মাঝারি
ত্রিভুজ চৌকোণ গোল মাথা।

মাথায় কালো সাদা বাদামী চুল।

চুল,
হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছে,
যেন উড়ন্ত চুলে
কুস্তির এক দিগন্তজোড়া আখড়া।

দুপুরের রোদে তেতে-ওঠা
উড়ন্ত সাদা কালো বাদামী চুল
হাওয়ায় ফরফর, ফরফর শব্দ তোলে।

শব্দে অজস্র পায়রা খোশ মেজাজে
নীল আকাশের ভাসমান মেঘের
ঝুলকি চালে
গিরিবাজের মতো ডিগবাজি খায়।

খেতে খেতে
মেঘভরা জলের আকাশে,
আকাশের নীল-সাদায়
উধাও হয়ে যায়।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি কবিতা লেখার জন্যে
রক্ত মাংস অস্থি পাঁজরের দেমাক নিয়ে
শহীদ মিনারের সব চেয়ে উঁচু ধাপ থেকে
ধীরে ধীরে নেমে আসে
সেই জ্বলন্ত কবি।

পোস্টারের মতো
লাল কালো সবুজ হরেক রঙ দিয়ে
বড় বড় দেমাকী হরফে লেখে :

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যিকারের
একটি কবিতা লেখার জন্যে চাই
ফুটন্ত চাল ডাল
সব্‌জি,
আগুন এবং কয়লা।

কয়লা এবং আগুনের জন্যে চাই
দীর্ঘ জ্বলন্ত মানুষ,
জ্বলন্ত মানুষের হাতে
জ্বলন্ত গিরিবাজ পায়রা।